পরম প্রেমময়
শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে
জড়ানো জীবন
অবকুণ্ঠ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

তব করুণ আঁখি

পরম প্রেমময়

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে

জড়ানো জীবন

তব করুণ আঁখি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এক পত্রভারতী উদ্যোগ
www.bookspatrabharati.com
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২০

অন্বেষা চ্যাটার্জি কর্তৃক সাধনা, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ **প্রত্যয়ভাস্বর জানা**

বিক্রয়কেন্দ্র পত্রভারতী। ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

TOBO KORUN ANKHI
Enriching words and wisdom of Shri Shri Anukul Chandra Thakur
by Sirsendu Mukhopadhyay
Published by SADHANA BHARATI, 1/1Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700 009
Phones 23501944, 94330 75550, 98308 06799
E-mail sadhanabharati2019@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-941261-7-1

" রা-স্বা "

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

পরমার্থভ্রাতা ও ভগ্নীদের
উদ্দেশ্যে
সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আমার নিত্য চিন্তন ও ধ্যানের বিষয়। যখনই তাঁর স্মৃতি, বাক্য, অনুশাসনের কথা মনে আসে তখনই তা লিপিবদ্ধ করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এসব লেখা কালানুক্রমিক নয়, কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীও নয়, মাঝে মাঝে মনের মধ্যে যেসব স্ফুরণ ঘটে, তারই লিপিবদ্ধ বিবরণ।

সূচিপত্র

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের বই

তব করুণ আঁখি

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের বই

হারিয়ে যাওয়া লেখা ১
হারিয়ে যাওয়া লেখা ২
হারিয়ে যাওয়া লেখা ৩
শীর্ষেন্দু ৭৫
এককুড়ি একডজন
মনের অসুখ
ঈগলের চোখ
ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে
ঝুড়ি কুড়ি গল্প
শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১
পাঁচটি উপন্যাস
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত
রূপ মারীচ রহস্য
ভৌতিক গল্পসমগ্র

তব করুণ আঁখি

তিনি একজন সহজ মানুষ। তাঁর জীবনযাত্রায়, তাঁর আচরণে, প্রতিক্রিয়ায়, হাসি বা দৃষ্টিতে কোথাও জটিলতা ছিল না। শক্ত মাটির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে জীবন ও জগৎকে অবলোকন করছেন, উপলব্ধি করছেন। কারও মন যদি জটিল হয়, অন্যের জটিলতাগুলিকে মেপে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেটুকু আমার মতো বুঝতে পেরেছি, তাতে আজ মনে হয়, তাঁর সহজ-সরল ও গভীর মন এক অলোকসামান্য ব্যাপার। আমার চেনা-জানা বলয়ে যত মানুষ দেখেছি, উচ্চ পর্যায়ের, সাধারণ পর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের, শিক্ষিত, ধীমান, প্রতিভাবান যেমন হোক কিছু না কিছু প্রকৃতির শিকার আমরা সকলেই। জটিলতা, অভিভূতি, বায়ুগ্রস্ততা এ সবই আমাদের নানাভাবে হয়রান করে মারে। এইরকম মানসিকতা নিয়ে অন্যকে বিচার করতে গেলে বা পরিমাপ করতে গেলে হিসেবে গোলমাল হবেই। স্বচ্ছ মন না থাকলে অবলোকন স্বচ্ছ হতে পারেনা। আবিলতা থেকেই যায়।

ঠাকুরকে আমি যখন প্রথম দেখি, শীতকালের এক ভোরবেলায় সৎসঙ্গ আশ্রমের নিরালা নিবেশ নামক পার্লারে। প্রথম দর্শনে আমার যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি অনেকবার, ঠিক পেরে উঠিনি। ঠাকুরকে পার্লারের বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিল, মস্ত জানালা দিয়ে। সেই সময়ে উনি একবার মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ক্ষণেকের জন্য তার চোখ আমার চোখে পড়েছিল। চোখে চোখ পড়তেই ভিতরে ভিতরে একটা মৃদু চমকানি টের পেলাম। এরকম চোখ তো জীবনে কখনও দেখিনি! পার্লারে ঢুকে পিছন ঘেঁষে বসতে জায়গা পেয়েছিলাম। সেখান থেকে নির্নিমেষ ওই সুন্দর মানুষটির দুখানা অপরূপ চোখ দেখছিলাম। মনে হয়েছিল, এরকম সরল, নিষ্পাপ চোখ যাঁর, তাঁকে এই পৃথিবীর কোনও পাপ কখনও স্পর্শ করেনি। শুধু সরল নয়, অন্তর্ভেদী সেই চোখে আর চোখ রাখতে পারছিলামনা। উনি আমার দিকে যখনই তাকাচ্ছেন তখনই আমাকে চোখ সরিয়ে নিতে হচ্ছিল।

আজকাল মনে হয়, সরল চোখ অর্জন পৃথিবীর কঠিনতম একটা কাজ। মানুষ যা কিছু দেখে তা অবলোকন করে নিজের নানা অভিভূতি, প্রবৃত্তিপরায়ণতা এবং মনের অল্প-বিস্তর বিকার নিয়ে। তাই যা সে দেখে তার ওপর তার নিজেরই নানা জটিলতার আস্তরণ বা মাত্রা যোগ হয়ে যায়। মনের ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউ নই। মন যাঁর অধীন ও আজ্ঞাবহ তিনিই একমাত্র বিকারশূন্য চোখে চারপাশটাকে দেখতে ও মাপতে সক্ষম। আমার এই মত মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে তা জানিনা, কিন্তু ঠাকুরকে দেখে দেখে এবং ভেবে ভেবে আমার এইরকমটাই মনে হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসী আমি অনেক দেখেছি বটে, কিন্তু কাউকেই ঠাকুরের পাশাপাশি মনে মনে বসাতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র একজন এমন মানুষ যাকে আমি নানাভাবে অবলোকন ও বিচার করার চেষ্টা করেছি। আমার সামান্য মেধা, অগভীর ভাব এবং নানা অভিভূতির জাল ভেদ করে তাঁর স্পষ্ট পরিচয়টা যে পেয়েছি এমন কথা বলা যাবেনা। তবে যা মনে হয়েছে তা সাধারণ বিচারে হয়তো অনেকটাই অতিলৌকিক মনে হবে। তাঁর প্রগাঢ় প্রেম, অফুরান ভালবাসার মধ্যেই ওই অতিলৌকিকতা।

ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের, অর্থাৎ যারা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাদের সূত্রবন্ধন ঘটেছে বা যোগাযোগ রচিত হয়েছে কোনও না কোনও বিপদ, শোক, দুঃখ বা ভয় তাড়িত হয়ে। সকলে না হলেও বেশির ভাগই তাই। মানুষের আপৎকালীন অবস্থায় যখন স্বাভাবিক উপায়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না বা যখন বেদনা, যন্ত্রণা বা তাড়না সহনীয়তার সীমা ছাড়ায় তখনই মানুষ খুঁজে খুঁজে তাঁর কাছে এসেছে। তাই আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, ইনি আমার ব্যথার ঠাকুর, দুঃখের ঠাকুর, যন্ত্রণার ঠাকুর। আধ্যাত্মিক অন্বেষণ থেকে

কেউ আসেননি এমন কিন্তু নয়। আমিই কয়েকজনকে জানি, যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়েই। তাঁদের সংখ্যা কম হলেও বিরল নয়।

ঠাকুরের জগৎ তাই এত বৈচিত্র্যে ভরা যে তা আমাকে হতবাক করে দেয়। তেমন বড় নামজাদা কেউ তেমন নয়, কিন্তু একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চ ও অতি উচ্চশিক্ষিত মানুষ, জমিদার থেকে চোর-ডাকাত, গরিব বড়লোক, চালাক বোকা, কবি বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, কে নয়? হিমাইতপুরে তাঁর বছর পঁচিশেক বয়সেই কীর্তন ও ভাবসমাধির যুগের শুরু। ঠাকুর অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন। কিন্তু কীর্তনের সময় তিনি গাইতেননা, বিভোর হয়ে নাচতেন নানা বিভঙ্গে। তখনই তাঁর ভাবসমাধি হত। ওই সময়েই তাঁকে ঘিরে সমাজের নানা স্তরের মানুষ জড়ো হতে থাকে। সে এক আশ্চর্য সমাবেশ।

এ সময়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অনেকেরই স্মৃতিকথায় প্রায় একই বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে এই সময়ে নানা কিংবদন্তীও সৃষ্ট হয়। আর হিমাইতপুরের মতো অজ পাড়া গাঁয়ে সম্পন্ন ও প্রভাবশালী মানুষরা ঠাকুরের উত্থান এবং তাঁকে ঘিরে বিশাল ভক্ত সমাবেশ সুনজরে দেখেননি। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। গাঁয়ের একজন গরিব ঘরের ছেলে হঠাৎ এরকম বিশেষ হয়ে উঠলে স্বভাবতই অন্যদের ঈর্ষা হতে পারে। কিন্তু তাঁরা তাতেই ক্ষান্ত না থেকে যথাসাধ্য ঠাকুরের সঙ্গে শত্রুতা ও সক্রিয়া বিরোধিতাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ঠাকুরকে আমি দেখি ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে। শীতকাল ছিল। আর দর্শনের পর এক সপ্তাহ বাদে দীক্ষা। সে অন্য গল্প। আমি শুধু ঠাকুরকে বুঝবার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। মানুষটার মধ্যে দেবত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই হয়তো, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ম্যাজিকটা লুকিয়ে আছে, যে অমোঘ সম্মোহন তার উৎসটাকে আমি অনেক খুঁজেছি। ঠাকুর যে স্তরে অবস্থান করেন তা আমার নাগালের অনেক বাইরে। আমাদের হিসেবনিকেশে তাঁর মাপজোখ করা সম্ভব নয়। তবু যা বা যতটুকু বুঝেছি তা হল তাঁর প্রগাঢ় এবং অতলান্ত ভালবাসা। ওই ভালবাসা এমনই প্রবল যে ঠাকুরের দেহভঙ্গিমার মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। আমার সাদামাটা চোখেও দেখতাম যেন একজন মানুষ ভালবাসায় মাখামাখি হয়ে যেন দলা পাকিয়ে বসে আছেন। কখনও মনে হত যেন চোখ এবং অঙ্গের জ্যোতিতে সেই ভালবাসাই চারদিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে যৎসামান্য, সঙ্গ করার তো সুযোগই ছিলনা, তাঁর দেহ কখনও স্পর্শ করিনি। অনেক ভক্তজনের মধ্যে আমিও একজন। তবু মনে হত কেন কে জানে যে, ইনি আমাকে আমার মায়ের মতোই ভালবাসেন।

ঠাকুরের সঙ্গে আলাপচারিতার প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ আমরা পাই "অমিয় বাণী" গ্রন্থে। অশ্বিনী বিশ্বাসের লেখা এই গ্রন্থটি ঠাকুরের প্রথম যুগের লীলা-বিবরণ। তখন ঠাকুরের বয়স মাত্র সাতাশ। ছিপছিপে রোগা পাতলা চেহারা, ভারী সুদর্শন। তাঁর তখন ভাবসমাধি হয়। ভক্ত অশ্বিনী বিশ্বাস ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এবং জিজ্ঞাসু পণ্ডিত। ঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়। ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে ও বিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংসার ছেড়ে ঠাকুরের কাছেই থেকে যান। বলতে গেলে অশ্বিনী বিশ্বাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি নানা প্রশ্নে ঠাকুরের অন্তর্নিহিত গভীর সত্তাকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুরের স্বরূপ তাঁরই জবানীতে অনেকটাই বের করে আনতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু ঠাকুরের সেই স্বরূপটি কেমন? এটাই জটিল প্রশ্ন। ঠাকুর যে-স্তরে অবস্থান করেন তা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির বাইরের জগৎ। ঠাকুরের সত্তা যে বিশ্বসত্তার সঙ্গে সর্বদাই লীন হয়ে থাকে তা হয়তো তত্ত্বগতভাবে জানা গেল। কিন্তু সেই অদ্বৈত অবস্থানের অনুভূতি আমাদের না থাকায় আমাদের জানাটাও হল বাকসর্বস্ব। নাম-ধ্যান-নিষ্ঠা-প্রেম উপজাত না হলে আমরা ওই স্তরের নাগাল পাবো কি করে? "বিশ্বময় আমি" বলে একটা বোধ আছে, এটা আমরা শুনেছি। কিন্তু শুধু শুনলেই তো আস্বাদ বা অবগাহন হয় না। তবে এই গ্রন্থটি পড়ে ঠাকুরের প্রতি একটা প্রবল টান অনুভব করেছি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কত দীনভাবে, কত সরলতা আর সরসতার সঙ্গে সহজ ভাষায় তিনি কথা বলছেন তা বিস্মিত করে। ভালবাসায় মাখামাখি

বাক্যগুলি যে কী সুন্দর! আর সেই অপূর্ব ভাষায় তিনি তাঁর স্বরূপের কথা বলছেন। কী আশ্চর্য সব কথা। ঠিক এভাবে আর কেউ বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক অকপট, তবু একটু রাখঢাক ছিল। ঠাকুর কিন্তু অসহায়ের মতোই আত্ম-উন্মোচন করছেন, যখন বলছেন, তিনি সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে অনুভব করেন, তাই পৃথগত্বের বোধ তাঁর নেই।

তখন ঠাকুরের কীর্তন যুগ। প্রায় সমবয়স্ক বা অধিক বয়স্ক শিষ্যদের সঙ্গেই তিনি সর্বদা থাকেন। কীর্তনে, কথায়, সদালোচনায় কোথা দিয়ে দিন রাত্রি অতিবাহিত হয় তা কেউ টেরই পাননা। শরীর ও মনে কারও কোনও ক্লান্তিরও অনুভব নেই। যৎসামান্য আহার্য জোটে এক বেলা। তাও কারও কোনও শারীরিক দুর্বলতা নেই। সে এক অবিশ্বাস্য যুগ। সে যুগের সকলেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। এক অনাবিল আনন্দের ধারায় তাঁরা ভেসে যেতেন, জাগতিক কোনও কষ্ট বা দুঃখ তাদের স্পর্শও করতনা। তবে এইভাবে চিরকাল থাকা তো ঠাকুরের উদ্দেশ্যও নয় অভিপ্রেতও নয়। জগৎ, জীবন ও জীবকূল রক্ষার্থে তাঁর ঐশী আবির্ভাব। ভাবজগতে তুরীয়ানন্দে বিচরণ করা তাঁর কাজ নয়। ব্যথা, বেদনা, শোক তাপে জর্জরিত পৃথিবীর কঠিন বাস্তবে তিনি তাঁর শিষ্যকূলকে নামিয়ে আনলেন। কীর্তনযুগের শেষে শুরু হল তার সংগঠনের যুগ।

অমিয়বাণী বহুকাল আগে লেখা, প্রায় একশো বছর হল বইটির বয়স। লেখক অশ্বিনী বিশ্বাস একজন ভক্ত মানুষই ছিলেন। তবু ঠাকুরের সঙ্গে একটি ব্যাপারে তাঁর মতের অমিল হওয়ায় তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে যান। পরবর্তী পর্যায়ে কি হয়েছিল তা আর জানা যায়না। কিন্তু বইটি পড়লে এই ঘটনাটিকে যথোচিত বলে মনে হয়না। অহং প্রবল হলে গুরুভক্তিতে ভাঁটা পড়ে যায়।

এটা ঠিকই গুরুর আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ খুব সোজা কাজ নয়। আমাদের সংস্কার, পূর্ব ধারণা, অহং, বৃত্তি প্রবৃত্তি বহুরকম বাধার সৃষ্টি করে। তবু আঁকড়ে থাকতে হয়। আর সেটাই সাধনা।

বাবা মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হয় বলে আমরা জানি। শাস্ত্রে তেমন বলাও আছে। কিন্তু এ যুগে ঐ ব্যাপারটায় বেশ ভাঁটা পড়েছে। দোষ বাবা মায়েরও আছে, শিক্ষা ব্যবস্থারও আছে, সমাজেরও আছে। আগে যৌথ পরিবারে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্মানসূচক দূরত্ব থাকত এবং ছেলেমেয়েরা ভাগ করে খাওয়া পরা শিখত। এখন তা নয়। বাবা, মা আর সন্তানের সংসারে আদিখ্যেতা এবং আত্মসর্বস্বতা বড্ড বেশি। অত্যধিক নৈকট্য ও পরস্পরের প্রতি অতি মনোযোগের ফলে সম্পর্কের প্রার্থিত দূরত্ব রচিত হয়না। ফলে ছেলেমেয়েরা বেহাতি হয়ে যায়। মেধাচর্চা হয়তো হয়, হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটেনা। এই প্রবণতা কখনোই ভাল নয়। আর বোধহয় এইজন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, ইষ্টভৃতির মতো পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতিও প্রবর্তিত করেছেন। ভক্তি শ্রদ্ধার চাষ পরিবার থেকে শুরু না হলে কিন্তু শিক্ষক এবং গুরুর প্রতিও শ্রদ্ধা আসতে চায় না।

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াকে ঠাকুর যত গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনটা কিন্তু একালে আর কোনও গুরু বা প্রতিষ্ঠান দেয়নি।

ঠাকুরের কীর্তনযুগ যেমন আনন্দময় তেমনি রহস্যময়ও। সেই সময়ে কতই না অলৌকিক ঘটনা বা মিরাকল ঘটত। তাই দেখে মানুষ বিস্মিত হত, বিরোধীরা ভয়ও পেত। এতসব অলৌকিক ঘটনা কেন ঘটত তা ভেবে আমার মনে হয়েছে, প্রথম যুগে এটার প্রয়োজন হয়েছিল মানুষকে নাড়া দেওয়ার জন্যই। বহুযুগের জড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার ট্র্যাডিশন যে-জাতিকে অলস ও শ্রমবিমুখ করে রেখেছে তা থমকে গেল ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য দেখে। অলৌকিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কীর্তনের অনুষঙ্গও এই আড় ভাঙার কাজ করেছে। ফলে তরুণ বয়সের অনুকূলচন্দ্রকে ঘিরে একটা উন্মাদনা তৈরি হল। আর তাঁর অসামান্য প্রেমমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মানুষগুলি আর ফিরে যেতে পারল না। কেউ কেউ সংসার ত্যাগ করে ঠাকুরের সঙ্গে কষ্টকর জীবনকেই বরণ করে নিল। কেউ কেউ সংসারের বন্ধনে আর আবদ্ধই হতে পারলনা, ঠাকুরের কাছেই রয়ে গেল। ঠাকুর সচেতনভাবে কোনও আশ্রম বা সংগঠন তৈরি করলেন না, ওসব তাঁর অভীষ্টও ছিলনা তখন। শিষ্যদের সঙ্গে বয়স্যের মতো মিশতেন, দিন রাত্রি কাটাতেন তাদেরই সঙ্গ করে, আলাপ-

আলোচনা-ধ্যান-জপের ভিতর দিয়ে। ওই নিবিড় মেলামেশার ভিতর দিয়েই ঠাকুর শিষ্যদের সত্তার জাগরণও ঘটাতেন।

শিষ্যদের সকলেই সমান মানের নয়। এক একজনের ক্ষমতা বা যোগ্যতা এক-একরকম। ঠাকুর ঠিক বুঝতেন, কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে। সুশীলদার জবানীতে জানতে পারি, তাঁকে দিয়ে ঠাকুর কত আপাত অসম্ভব নানা কাজ করিয়েছেন, টাকা পয়সার যোগান ছিলনা, সাহায্যকারী ছিলনা, আর তখন সৎসঙ্গীয় সংখ্যাও ছিল কম। ওই অবস্থায় শুধু সৎনাম আর বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সুশীলদা যে সমস্ত কাজ উদ্ধার করে এসেছেন তা জেনে হাঁ হয়ে গেছি। অথচ সুশীলদা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার জন্য তাঁকে কত প্রতিষ্ঠান থেকে ডাকাডাকি করেছে, এমনকি ঠাকুরের কাছেও দরবার করেছেন তাঁরা। কিন্তু ঠাকুরের অনুমতি সত্ত্বেও সুশীলদা ঠাকুরকে ছেড়ে যাননি। আজীবন ঠাকুরের সান্নিধ্যেই থেকে গেলেন। ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ যে কী গভীর তা সুশীলদার মতো মানুষকে দেখলেই বোঝা যায়। তেমনি আর একজন ছিলেন বঙ্কিম রায়। কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। সুশীলদা তাঁকে বলে কয়ে হিমাইতপুরে উৎসবের কাজে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি সাত দিনের জন্য যেতে রাজি হন। কিন্তু সেই যে গেলেন আর ঠাকুরের কাছ থেকে আলাদা হতে পারলেননা। আজীবন রয়ে গেলেন তাঁর কাছে।

ঠাকুরের এই সম্মোহন নিয়েই নানা অপপ্রচারও হয়েছে। তিনি নাকি হিপনোটিজম জানেন, মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রেখে দেন, ইত্যাদি। কিন্তু ভালবাসা গভীর হলে তার সম্মোহনও যে কত গভীর হতে পারে সেটাই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা। তারা স্বার্থের নজর দিয়ে সব কিছু বিচার করে। নইলে তারা বুঝতে চেষ্টা করত এত মানুষ তাদের ঘরের আরাম আয়েস ছেড়ে কেন ঠাকুরের কাছে অত কৃচ্ছ্রসাধন করে পড়ে আছেন!

ঠাকুরের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারী। একজন শরীরী মানুষের মধ্যে লোকোত্তর বিশ্বসত্তার প্রকাশ কিভাবে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল তার খানিকটা আস্বাদ তাঁরা পেয়েছেন। তবু তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে অনুধাবন করার মতো ধী এবং প্রজ্ঞা তো সকলের নেই। ঠাকুরের চৌম্বক আকর্ষণ অনেক পরবর্তীকালে ঠাকুরের পরিণত বয়সে, দেওঘরে আমরা তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে অনুভব করেছি। সান্নিধ্য বলতে তাঁর খুব কাছে যাওয়া বা তাঁকে স্পর্শ করা ইত্যাদি নয়। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আমাদের অবস্থান করতে হত। সুতরাং সান্নিধ্য বলতে শুধুই দর্শন। আলাপচারিতাও নয়। কারণ আমাদের তখন কেউ তেমন পাত্তাও দিতনা। কিন্তু ওই দূরের দর্শনও যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে তা মর্মে মর্মে টের পেয়েছি। তাহলে তাঁর নিকট সাহচর্য পেলে আকর্ষণ যে কতটা হতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব নয়।

কীর্তন যুগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলে ঠাকুরকে অনেক সহজে জানা যেত। কারণ তখন বয়সে তরুণ ঠাকুর সকলের সঙ্গে সহজে মিশে যেতেন, শিষ্যদের সঙ্গেই তাঁর দিনরাত কাটত। আর তার মধ্যেই চলত নামধ্যান এবং সদালাপ। কীর্তন যুগে যাঁরা ঠাকুরের সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরা অশেষ ভাগ্যবান। জীবন যাপনে ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রসাধন ছিল বটে, কিন্তু মন ভরে থাকত ঐশী আনন্দে। ওই সময়েই ঠাকুর নিজের স্বরূপ অনেকটাই প্রকাশ করেছিলেন। বোধহয় যুগের প্রয়োজনেই। আত্মপরিচয় প্রদান করার দরকার হয়েছিল শিষ্যদের মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটাতে।

সুশীলচন্দ্র বসু ঠাকুরের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা এবং ঘটনার কথা বলেছেন তা বিস্ময়কর। প্রায় শূন্যহাতে ঠাকুর প্রায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। আর সাম্রাজ্য বলতে শুধু সম্পদ আহরণ নয়, মানুষ অর্জন। আর তাঁর নির্দেশে এইসব সাধারণ মানুষই যে কত শিল্প, কত কলকব্জা, কারখানা অবধি তৈরি করে ফেলল তার বৃত্তান্ত আমাদের অবাক করে দেয়।

ঠাকুর যে কতখানি মাতৃভক্ত ছিলেন তা সুশীলদা, পঞ্চানন সরকার, ব্রজগোপাল দওরায়ের লেখা বিবরণ থেকে জানতে পারি। বলতে গেলে সেই প্রথম যুগে শক্ত হাতে এবং পরম মমতায় আশ্রমের কাজকর্ম এবং শৃংখলা বজায় রাখতেন মাতৃদেবী মনমোহিনী। পুত্র অনুকূলচন্দ্র তাঁর ন্যাওটা ছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের মাতৃত্ব

শুধু নিজের সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আশ্রমের প্রতিটি মানুষকেই তিনি নিজ পুত্রকন্যার মতো দেখতেন। একজন উপোসী থাকলেও তিনি নিজে আহার্য গ্রহণ করতেননা।

একই সঙ্গে কোমল ও কঠোর জননী সমগ্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপা ছিলেন। আর ঠাকুর ছিলেন মাতৃগত প্রাণ। সেটা এতটাই যে ঠাকুর মাছ-মাংস খাওয়ার ঘোর বিরোধী সত্ত্বেও মায়ের আদেশে আমিষ ভক্ষণ করেছেন, শুধুমাত্র মাকে খুশি করার জন্য। মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে এমন কাজ কখনও করতেননা। পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী নিরীহ মানুষ ছিলেন। অতি শান্ত ও ভদ্র। কিন্তু ঠাকুর, যতদূর জানা যায়, বাবাকে অত্যধিক সমীহ করতেন। অথচ শিবচন্দ্র ছেলেকে বিশেষ শাসনটাসন করতেননা। শিবচন্দ্র এতটাই আপনমনে থাকতেন যে, ভক্তদের জবানীতে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায়না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, উনি ছিলেন অতিশয় সজ্জন ও ধর্মভীরু মানুষ। তাঁর সততা ছিল সংশয়াতীত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের পর, বিশেষ করে কীর্তনের যুগে শিবচন্দ্র ও মনমোহিনীর ছোটো সংসার বিশ্বসংসারের দিকে বিস্তারিত হতে লাগল। ব্যক্তিগত সংসারযাপন আর রইলনা, ভক্ত সমাগমে তার সীমানা গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। ঠাকুর তখন প্রেমে ভক্তিতে মাতোয়ারা, মা মনমোহিনী শক্ত হাতে সংসারের হাল না ধরলে সংসার প্রায় ভেসেই যেত।

মা যে ঠাকুরকে খুব প্রশ্রয় দিতেন তা নয়। যথেষ্ট শাসনও করতেন। এমনকী প্রহার পর্যন্ত। মায়ের হাতে এরকম আদরের প্রহার তৎকালে অনেক ভক্তের কপালেও জুটেছে। পঞ্চানন সরকার কবুল করেছেন, মাতা মনমোহিনীর হাতে তিনি বিস্তর চড়চাপাটি খেয়েছেন। তখন তাঁরা শিশু বা নাবালক নয়, রীতিমতো যুবাবয়সি।

মহাপুরুষদের মধ্যে দুটো জিনিস দেখা যায়। এক নির্জনে, বিরলে বসে সাধনা আর প্রচার পরিক্রমা যা যাজন কার্যে পরিভ্রমণ। ঠাকুরের কোনওটাই ছিলনা। একদিকে অনন্ত মহারাজকে নির্জন সাধনার নির্দেশ দিয়েছেন, মাসাধিককাল মৌনব্রত পালন করিয়েছেন। কিন্তু নিজে তেমন কিছু করেননি।

ঠাকুর বলেছেন, বিরলে বসে সাধনা করার চেয়ে, কাজকর্ম, আলাপ, আলোচনা এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকেই তিনি সাধন-ভজন করেছেন।

বিরলে নির্জনে বসে সাধনা করা সহজ, কিন্তু নানা কর্মকাণ্ডের ভিতরে সক্রিয় থেকেও সাধন-ভজন বজায় রাখা অতীব কঠিন। আর ঠাকুর এই কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছেন। এক বাণীতে ঠাকুর বলেওছেন, চলাফেরায় জপই ভালো, আর চব্বিশ ঘণ্টাই সব কাজের মধ্যেই ধ্যানস্থ থাকা যায়। কিভাবে নাম করতে হবে বলতে গিয়ে বলেছেন, তোমার ভিতরে বসে যেন আর একজন কেউ জপ করে যাচ্ছে, এমন ভেবে নিতে হয়। নাম প্রসঙ্গে ঠাকুর এমনও বলেছেন, মায়ের গর্ভে যখন ছিলেন তখনও তাঁর নাম হত।

নামময়তা কাকে বলে তা ঠাকুরকে দেখে খানিকটা বুঝেছি। আর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সব কাজের মধ্যে নামজপ বজায় রাখা কত কঠিন কাজ। কিন্তু সজাগ থেকে অভ্যাস অনুশীলন করে নাম জাগ্রত করে নিতে পারলে যে কত অশৈলী কাণ্ড হতে পারে তাও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। কিন্তু ওইরকম ভাবটা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ঠাকুর যেমন নামেরই মূর্ত পুরুষ তেমন আর তো কেউ নয়। ওই নামই তাঁর স্বরূপ। তিনি নামের কর্তা, নামের মালিক এবং স্বয়ং নাম। আমাদের কাজ হল ওই নামসূত্র ধরে তাঁর কাছে যাওয়া।

যে যত নামময় সে তত ঠাকুরের কাছাকাছি। আর যে যত ঠাকুরের নিকটবর্তী হয়ে থাকতে পারে তার ওপর ততই ঠাকুরের ছায়াপাত হয়।

ঠাকুরের বাল্য-কৈশোরের পর যৌবন যখন এল তখনই তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার। কোনও প্রশ্নই তাঁর কাছে অসমাধিত নয়। আর যাঁরা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁদের ওপর তাঁর যেমন ভালবাসা, তেমনি অফুরান প্রশ্রয়। এই শিষ্যদের অনেকেরই নানারকম প্রবৃত্তি তাড়না ও বিকার ছিল, অনেকের ছিল নেশা এবং অভিভূতি। ঠাকুর শিষ্যদের ঝেড়ে বেছে নেননি। সকলকেই নির্বিচারে টেনে নিয়েছেন কাছে। আর তাঁর

নিজস্ব পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবনের ধারার মধ্যে রেখেই তাঁদের বিকার ও বিকৃতির নিরাময়ও সাধন করেছেন।

ঠাকুর আশ্রম শব্দের অর্থ করেছেন, যেখানে শ্রমের মাধ্যমে জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করা হয়। আশ্রম মানে প্রগাঢ় শান্তি ও কর্মহীন স্তবস্তুতি নয়। বরং ঠাকুরের পরিবেশ সেরকম ছিলনা। ঠাকুর কীর্তন যুগের পরে যে কর্মক্ষেত্র রচনা করেন তা বিচিত্র ও বিস্ময়কর। আজও তাঁর করা বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রটির কথা মানুষ ভোলেনি। তাছাড়া কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের যেন উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন ঠাকুর। সৎসঙ্গের হোসিয়ারিতে তৈরি গেঞ্জির তখন বিপুল খ্যাতি, তেমনি সুনাম সৎসঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের। আশ্রমকে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের আধার করে তুলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

আবার, আশ্রম যে অর্থাগমের বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা নয় সেটা বুঝিয়ে দিতে এইসব কর্মকাণ্ড থেকে লোকের উদ্দীপনাকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন ঠাকুর। কিন্তু এই বিশ্বাসটা পাকা করে দিয়েছিলেন যে, কোনও মানুষই অপারগ নয়, ইচ্ছে করলেই যে নিজের উদরান্নের সংস্থান নিজেই করে নিতে পারে। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর বিশ্বাস আর আস্থা এনে দিয়েছিলেন ঠাকুর। পরবর্তীকালে দেওঘরে ঠাকুর আর অত বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের অবতারণা করেননি।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মের কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ সহ সব মহাপুরুষই ধর্মাচরণে কর্মের গুণকীর্তন শতমুখে করেছেন। ঠাকুর শুধু কর্মের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, কর্মে ফলিত রূপ এবং তার রকম হাতেকলমে করিয়ে নিয়ে মানুষ তৈরি করে দিয়েছেন। ঠাকুরের নিজের জীবন সংসারী সন্ন্যাসীর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। কর্মদর্শনের সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আর এটাও বুঝতে সাহায্য করেছেন যে, প্রকৃত কর্মই আদতে ধর্মাচরণ। অস্তি-বৃদ্ধির নিরাময় যা, মানুষ ও তার পরিবেশকে যা রক্ষা এবং বর্ধিত করে তাই ধর্ম। দেখা যায় ঠাকুর যেরকম বলেছেন ঠিক তেমনভাবে জীবন-চালনাকে নিয়ন্ত্রণ করলে ধর্মাচরণের স্বাদ পাওয়া যায়।

"ভীমকর্মা" কথাটা ঠাকুরের খুব পছন্দ ছিল। ঠাকুর চাইতেন তাঁর প্রিয় মানুষগুলি ভীমকর্মা হয়ে উঠুক। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে সবাইকে দিয়ে সব কাজ হওয়ার নয়। তবু চাপিয়ে দিতেন গুরুদায়িত্বের ভার এবং সময় দিতেন বেঁধে। ফলে ওইসব মানুষেরা দিশেহারা হয়ে যেত প্রথমটায়। তারপর ছোটাছুটি শুরু করত, মাথা খাটাতে শুরু করত, নাম আশ্রয় করে ঠাকুরের ওপর নির্ভরতা নিয়ে ঠিকঠাক উৎরেও দিত কাজ। আর ওইভাবে একে একে কত যে কর্মের যোগী ঠাকুর নিজের হাতে তৈরি করেছেন তার লেখাজোখা নেই। অনেক অসম্ভব, আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব কাজও সমাধা করিয়েছেন। আর এসব পাই সুশীলচন্দ্র বসু, পঞ্চানন সরকার, ভোলানাথদা, কেষ্টদা প্রমুখ অনেকের জবানী মারফৎ। গাড়িভাড়া নেই, খাওয়ার পয়সা নেই, কপর্দকশূন্য অবস্থায় বেরিয়ে গিয়ে শুধু ঠাকুরের ওপর অগাধ বিশ্বাস আর নামজপ সম্বল করে লাখো লাখো টাকার কাজ সমাধা করেছেন তাঁরা। কাউকে এক পয়সা ঠকানোর জো ছিলনা, মিথ্যে কথা বলা বা ধাপ্পা দেওয়ার উপায় ছিলনা, বাকিতে মাল নিয়ে শোধ না দেওয়ার ফিকির ছিলনা। সামান্যতম বেচালও ঠাকুর বরদাস্ত করতেন না। তবু কাজ ঠিকই উদ্ধার হয়ে যেত। মানুষের পারগতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠাকুর জানতেন যে, মানুষের পারগতার সীমা নেই। তাই ঠাকুর বলতেন Fatigue layer পার হয়ে গেলে আবার নতুন কর্মোদ্যম ফিরে আসে। একটা সময়ে, আশ্রমের প্রথম যুগে দিনের পর দিন ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গ দিবারাত্র কীর্তন-নামধ্যান-আলাপ আলোচনায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে তাঁদের দিনের পর দিন ঘুমের বালাই ছিলনা। এক মাস দেড় মাস না ঘুমিয়েও কারও শরীর খারাপ হয়নি কখনও। আর পুষ্টিকর খাবার তো দূরস্থান একবেলা ভরপেটও সবসময়ে জুটত না। তাও জলের মতো ডাল আর ভাত। আর তাতেই উপচে পড়ত মানুষের স্বাস্থ্য এবং অমিত কর্মোদ্যম।

মনে করলে শিহরন হয় যে, ঠাকুর কখনও এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিযুক্ত থাকতেন না। ছায়ার মতো থাকতেন ভক্তদের সঙ্গে। তাঁর ওই সাহচর্যই মানুষের মধ্যে অফুরান কর্মোদ্যমের জোয়ার নিয়ে আসত। একজন মানুষের কাছাকাছি থাকলেই এরকম অনুপ্রেরণা এবং শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে, এটা অনেকেই

ঠিক বিশ্বাস করতে পারতনা। আমি নিজে তো তাঁকে অনেক পরে দেখেছি। কিন্তু তাঁর কাছে গেলেই যে শরীর ও মনে একটা উদ্দীপনা আর প্রাণশক্তির আলোড়ন তৈরি হয় এটা বুঝতে এক লহমাও দেরি হয়নি।

"নারীর নীতি" আর "নারীর পথে" বই দুখানা পড়লে এখনকার নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতারা নিশ্চিতভাবেই ক্রুদ্ধ হবেন এবং নাকচ করবেন। ঠাকুর এ দুটি গ্রন্থে যেসব কথা বলেছেন তা তথাকথিত নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী বলেই মনে হবে। প্রথমটায় আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক অন্যান্যদের দাম্পত্য জীবনের যে তথ্যসমূহ জানতে পারছি তাতে নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নই বড় না সংসারে শান্তি বড় সেইটে আমাকে ধন্দে ফেলেছে। দীক্ষা নেওয়ার বছর তিনেক বাদে আমি বিয়ে করি। দীর্ঘদিন হোস্টেলে মেসে থেকে একরকম বল্গাহীন জীবনযাপনের পর দাম্পত্যে প্রবেশ করে ভারী খটোমটো লাগতে লাগল। আবার আমার জীবনে প্রথম এবং একমাত্র নারী আমার স্ত্রী। অর্থাৎ মা, বোন, দিদির বাইরে যে সম্পর্ক সেইখানে আমার অবলম্বন একজন নারীই। দাম্পত্য কলহ, মতান্তর, মনান্তর বিস্তর হয়েছে বটে, তবু লক্ষ্য করেছি আমার স্ত্রী আমার ওপর নির্ভর করতে ভালবাসেন। নারী স্বাধীনতার কথা উঠলেই তিনি বেশ ক্রুদ্ধ হন। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখেছি, আমার সঙ্গে যতই ঝগড়া বা অশান্তি হোক, তিনি আমাকে ছেড়ে বেশি দিন কোথাও গিয়ে থাকতে পারতেননা, এমনকী বাপের বাড়িতেও না। এখন পরিণত বয়সে ঠাকুর-কেন্দ্রিক জীবন বহুদিন যাপন করার পর স্ত্রীকে আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ আমার স্ত্রীও সেরকমই মনে করেন। নারীর নীতি ও নারীর পথে গ্রন্থ দুটি যে আমার স্ত্রীর জীবনে হুবহু অনুসৃত হয়েছে তা নয়। তবু ঠাকুরের ওই দুটি গ্রন্থের প্রভাব তাঁর ওপর অনেকটাই ক্রিয়া করেছে।

মহিলাদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা পুরুষের চিরকালীন। আর এযুগে সেই প্রবণতার বিস্তার ঘটেছে বিপজ্জনকভাবে। মেয়েরা স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা যত বলছেন ততই তাঁরা নিজেদের পুরুষদের কাছে আরও আকর্ষণীয়া করে তোলার জন্য ব্যাকুল। নিজের শরীরের বিজ্ঞাপন তাঁদের বড়ই প্রিয়। এই বৈপরীত্যই পারস্পরিক ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। চারদিকে প্রেমের জয়গান যত গাওয়া হচ্ছে ততই বাড়ছে ধৈর্যহীনতা, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত সহবাস এবং বিবাহবিচ্ছেদ। স্বাধীনতা ব্যাপারটাই এখন বিপন্ন। যথেচ্ছাচারকেই প্রগতিশীল মহিলারা স্বাধীনতা মনে করেন কিনা সেটাই প্রশ্ন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর একটা লেখায় মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা কেবল মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলো কেন? পুরুষদেরও কি স্বাধীনতার দরকার নেই?

ঠাকুর মেয়েদের মা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন আমাদের। বলেছেন, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ। বলেছেন, মা মা-ই, কামিনী নয়কো। কিন্তু সভ্যতা যত এগোচ্ছে ততই সংজ্ঞা এবং ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। বাড়ছে বিভ্রান্তিও। মহিলারা স্বাধীনতার কথা বলছেন, আবার ভোগ্যপণ্য হওয়ার জন্যও প্রাণান্ত করছেন। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ডায়েটিং, বিউটি পার্লার, কসমেটিক সার্জারি যেমন, অন্যদিকে মডেলিং, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, যৌন আবেদন বৃদ্ধি ইত্যাদির ভিতর দিয়ে হয়ে পড়ছেন দেহসর্বস্ব। ঠাকুরের কথা হয়তো তাঁদের ভাল লাগবেনা। কিন্তু যদি কেউ ঠাকুরের অনুশাসন গ্রহণ করে, আমার তো মনে হয় জীবনে সুখ-শান্তি, সংসারে আধিপত্য, ভাল শিশুর জন্মদাত্রী হওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়।

স্ত্রী যতই সুন্দরী হোক বা স্বামী যতই আকর্ষণীয় হোক, বিয়ের কয়েক বছর বা তারও আগে দাম্পত্যজীবন একটু একটু করে একঘেয়ে হয়ে যেতে থাকে। তখন মনে হয় পরস্পরের কাছ থেকে আর নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই, পরস্পরকে আর কিছু দেওয়ারও নেই। যেন দুজন মানুষই দুজনের কাছে ফুরিয়ে যেতে থাকে।

এই প্রবণতাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। একটা বিপজ্জনক মনোসঙ্কট। এর মূলে আছে পরস্পরের প্রতি কামজ আকর্ষণ, যার ভিত্তিতে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঠাকুর তাই বলেছেন, কাম বা দেহজ আকর্ষণের সম্পর্ক কখনোই স্থায়ী হয়না। কারণ ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক আকর্ষণ, রূপমুগ্ধতা বা গ্ল্যামার-প্রীতি

সম্পর্ককে ধরে রাখতে পারেনা। এইরকম সম্পর্ক গভীর নয়, স্থায়ী তো নয়ই। ফলে আধুনিক যুগে দাম্পত্য সম্পর্কগুলি বড্ড ক্ষণভঙ্গুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপক, তার হাওয়ায় এদেশেও ঘরে ঘরে ঘর-ভাঙার পালা শুরু হয়েছে। ঠাকুর বিবাহ-বিচ্ছেদ খুবই অপছন্দ করতেন। বিয়ে ভাঙা মানে, আমার মতে, মানুষের একটা পরাজয়ও তো! পুরুষ বা নারী উভয়তরে এই পরাজয়। হয়তো বা পুরুষের দায়ভাগ একটু বেশি। কারণ প্রকৃতির নিয়মেই পুরুষ বহুগামী, নারী তা নয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পুরুষের আবেগ যতটা বেশি দায়িত্ববোধ ততটা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোনও পুরুষ কোনও মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হলে তার জন্য পাগল হয়ে ওঠে এবং তাকে পাওয়ার জন্য সম্ভব অসম্ভব সবকিছুই করতে প্রস্তুত থাকে। নারীপ্রেমে পাগল পুরুষের জন্য দুনিয়াতে অনেক অঘটন ঘটেছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারতে দেখেছি মহা মহা যুদ্ধের পিছনে রয়েছে ওই উন্মত্ত নারীপ্রেম। কিন্তু প্রার্থিত নারীটিকে লাভ করার কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু পুরুষের সেই আবেগ উধাও হয়। প্রিয় নারীতে অরুচি আসে। ঠাকুর ভালবাসার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এক কথায় অনবদ্য। বলেছেন, ভালবাসা মানে যাকে ভালবাসা যায় তার ভালতে বাস করা। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক আবেগ বা যৌন আকর্ষণ নয়, মাঙ্গলিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আকর্ষণ, যা ভালবাসার মানুষটির স্বস্তি বিধান করে তাকে পরিপূরণ করে। দেহসৌন্দর্যকে গুরুত্ব দিলে ভুল হয়, কারণ সৌন্দর্যের আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী। ভালবাসার মধ্যে হয়ে-ওঠা আছে, গড়ে-তোলা আছে, স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে যে সংসার-সৌধটি গড়ে ওঠে তার ভিত হচ্ছে পরস্পরের বিশ্বস্ততা। ভালবাসা শুধু আবেগের কথা নয়, তার ভিতরে অনেক দায়-দায়িত্ব এবং ত্যাগস্বীকার থাকে। এখনকার নারী ও পুরুষের লঘুচিত্ত ভালবাসা ব্যভিচারেরই নামান্তর।

ঠাকুর মহিলাদের সতীত্ব, শুদ্ধতা এবং পতিপ্রেমকে প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন, তার কারণ তিনি মনে করতেন, নারীজাতিই সমাজের প্রকৃত ধারক ও বাহক। তারা ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে।

নারী ভোগ্যবস্তু নয়, কামনার প্রতীক নয়, বিজ্ঞাপন বা মডেলের উপাদান নয়—এটা নারীবাদীরা আর বুঝবেন কবে? তাঁরা কবে হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, একজন নারীই সংসারের নিউক্লিয়াস। তিনি মক্ষিরাণীসদৃশ হয়ে গেলে গোটা সংসারের ধারণাই ভেঙে পড়বে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন জঙ্গলের রাজত্ব ছিল তখন বিবাহ বস্তুটিই ছিলনা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা ধারণা আবিষ্কৃতই হয়নি, তখন যথেচ্ছ যৌনমিলন হত। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ বাস্তববোধ থেকেই হৃদয়ঙ্গম করল, এই ব্যবস্থায় শৃংখলা নেই, গঠন বা নির্মাণও নেই, সংহতিরও অভাব। ফলে বিবাহ, সম্পর্ক, পরিবার ইত্যাদির ধারণা ও রূপায়ণ এল। আর ওরই প্রতিবিম্ব বা ফলিত বৃহত্তর রূপ হল সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি। মনে রাখা দরকার, পরিবার বা সংসারের ভিত মজবুত না হলে রাষ্ট্রও নড়বড়ে হয়ে যায়।

কথা হল, এখনকার দুনিয়া নানা মতবাদে বিভক্ত। আবার ক্রমাগত এইসব মতবাদের আংশিক সমন্বয়ে নূতনতর অভিমত তৈরি হচ্ছে। মানুষ বুঝতেই পারছেনা, কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা নয়। ফলে মানুষের চিন্তাভাবনার ভিতর, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিতর নানা বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা। বেশির ভাগ মানুষই নিজের গন্তব্যকে সুনির্দিষ্ট করে উঠতে পারছেনা। এই যুগে যে এই বিভ্রান্তি আসবেই তা ঠাকুর অভ্রান্তভাবেই জানতেন। আর তাই মানুষকে একটা সুনির্দিষ্ট পথরেখার সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলতে গেলে সস্তা প্রগতির উন্মাদনা বর্জন করতে হবে এবং বিসর্জন দিতে হবে নিজস্ব মন-গড়া ধ্যান-ধারণারও। ঠাকুর কোনও অলীক ঈশ্বরের কথা বলেননি, এমনকি ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও বিতর্ক থেকে বিরত করতে চেয়েছেন মানুষকে। তাঁর অনুশাসন অস্তি ও বৃদ্ধির ওপরেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মাচরণ বস্তুতই অস্তি ও বৃদ্ধিকে রক্ষা ও বর্ধিত করা। পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞাও নির্ধারিত করেছেন ঠাকুর এই অস্তি-বৃদ্ধির নিরিখেই। রক্ষা থেকে যা পতিত করে তা-ই পাপ আর অস্তিত্বকে যা রক্ষা করে তাই পুণ্য।

ঠাকুরের জননী মাতা মনমোহিনী দেবী সম্পর্কে যতটুকু জানি ওই হচ্ছে নারীর আধিপত্যের রূপ। যেমন স্বামীর কাছে লক্ষ্মীস্বরূপা, সন্তানের কাছে জগদ্ধাত্রী, তেমনি আবার প্রয়োজনে চণ্ডিকামূর্তি। আশ্রমে সবাই

যখন নিদ্রাগত মা লাঠি লণ্ঠন হাতে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন পাহারা দিতে। তাঁকে যমের মতো ভয় পেত সবাই। একই সঙ্গে এই কল্যাণী ও রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করতে পারাই নারীর প্রকৃত রূপ। আর অমন মা না হলে কি তাঁর গর্ভে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ঘটে!

এ যুগের মেয়েদের জীবন নানা কৃত্রিমতায় ভরা। রূপ, ফিগার, গ্ল্যামার, যৌন আবেদন, ইগো এসবই তাঁদের দৈনন্দিন চর্চার বিষয়। তাঁদের কাছে বিয়ে করা মানেই পরাধীনতা, রান্না করা মানেই আত্মাবমাননা। সর্বত্রই তাঁরা নারীমুক্তির প্রতিবন্ধকতা দেখছেন। ঠাকুরের নারী সম্পর্কিত কথা তাঁদের ভাল লাগবে না। বিশেষ করে স্বামীর প্রতি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, আনুগত্যের নিদান ঠাকুর দিয়েছেন তা তাঁদের পক্ষে হজম করা শক্ত। ফলে এ যুগের উন্মার্গগামী নারীশক্তি ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়বেন।

ঠাকুরের জীবন মাতৃকেন্দ্রিক, একথা মোটামুটি সবাই জানে। দয়ালবাগের সরকার সাহেবের কাছে মাতা মনমোহিনী ঠাকুরের দীক্ষার জন্য চিঠি লেখেন। সরকার সাহেব জননীকেই দীক্ষা দান করার নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারে জননীই তাঁর পুত্র অনুকূলচন্দ্রকে দীক্ষা প্রদান করেন। সেই হিসেবে মা ছিলেন ঠাকুরের ঋত্বিক। পুণ্যপুঁথিতে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় প্রদত্ত বাণীর মধ্যে এক জায়গায় আছে, সরকারসাহেবই ওয়াক্ত গুরু। ওয়াক্ত মানে, আমি যতদূর জানি, ব্যক্ত। কিন্তু "ওয়াক্ত গুরু" কথাটার অদ্ভুত অর্থ যা ঠাকুর ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এটা মনে হয়েছে, হুজুর মহারাজ ও সরকার সাহেবের প্রতি ঠাকুরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। নিজের চোখে দেখেছি, প্রার্থনার ঠিক আগে ঠাকুর এই দুজন এবং নিজের পিতামাতার ছবি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বহুক্ষণ ধরে প্রণাম করতেন।

শ্রদ্ধা ও মমতা এই দুটি জিনিসের প্রগাঢ় প্রকাশ ঠাকুরের মধ্যে সবসময়েই দেখতে পেতাম। অজানা, অচেনা, অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কি নিবিড় ভালবাসার সঙ্গে কথা বলতেন। দুখানি চোখ যেন মায়ার সমুদ্র। কি অনাবিল হাসি ছিল তাঁর!

আমি তাঁর সঙ্গে যতবার কথা বলেছি, চোখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমার তুচ্ছতা, সামান্যতা, আমার আত্মগ্লানি, অপ্রতিভতা সব যেন শুধু চোখের চাউনিতেই ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। একটু ভয়ও পেতাম ঠাকুরকে, ওরকম গভীর চোখ তো কখনও দেখিনি।

ঠাকুর একটি ড্রেস কোড প্রচলন করেছেন। কালোপেড়ে ধুতি আর সাদা হাফ হাতা (কনুইয়ের নিচে অবধি ঝুল) পাঞ্জাবি, তৎসহ সাদা দেড়পাট্টা চাদর। দেড়পাট্টা চাদর আবার কাপড়ের অংশ জুড়ে নিয়ে বানাতে হয়। একটু চৌকোমতো দেখতে। সুবিধে হল মার্কিন কাপড়ের এই দেড়পাট্টা চাদর ধ্যানের সময় মাথা এবং সর্বাঙ্গ ঢাকা দিতে সাহায্য করে। ঠাকুর সর্বদাই কালোপেড়ে ধুতি পরতেন, আর খালি গা। শীতকালে একটা সাদা ফতুয়া পরতেন। তাঁর বিছানা এবং পোশক সাদা মানে ঝকঝকে বা ধপধপে সাদা। পায়ে কালো রঙের চামড়ার চটি পরতেন। কলকাতা কলেজ স্ট্রিটের রাদু বা কে এম দাসের দোকান ঠাকুরের চটি বানিয়ে দিত। তাঁর ঘরে মহার্ঘ্য বা অত্যাধুনিক আসবাব বা জিনিসপত্র দেখা যেতনা। বড্ড সাদামাটা, নিরাভরণ ঘর। তবে বড় ঘর ছাড়া থাকতে পারতেননা। তাঁর চৌকিখানাও বিশাল বড়। এ ছাড়া কোনও বাহুল্য নেই। দেখার মতো হল ঠাকুরের পরিচ্ছন্নতা। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমি কুত্রাপি দেখিনি।

ঠাকুর শুধু নিজের ঘরখানাকেই গুরুত্ব দেননি। পারপার্শ্বিককেও পরিচ্ছন্ন ও মলমুক্ত করেছেন। আশ্রম রচনা করতে গিয়ে যাতে কোনও গাছ কাটা না যায় সেদিকে তাঁর প্রখর নজর ছিল। পারিপার্শ্বিককে ঠাকুর যে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর বিভিন্ন আলাপচারিতায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। পারিপার্শ্বিকই বাঁচিয়ে রাখে আমাদের, তাই পারিপার্শ্বিককে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের অস্তিত্বের পক্ষেই জরুরী। জীবজন্তু, পোকামাকড়টার প্রতিও কী গভীর মমতা ছিল ঠাকুরের!

এক লহমায় যিনি পৃথিবীর সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারেন, সব অভাব মোচন করতে পারেন, নরকে স্বর্গ রচনা করতে পারেন তিনি মানুষের দুঃখে কেনই বা কাঁদেন, কেনই বা ভেঙে পড়েন বা হাহাকার করেন।

অতি সঙ্গত প্রশ্ন। এ প্রশ্ন বারংবার আমারও মনে উদয় হয়েছে। ঠাকুর সব করতে পারেন। কিন্তু করেননা কেন?

এ প্রশ্নের জবাব ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিয়েছেন। বলেছেন মানুষের বৃত্তিপ্রবৃত্তিতাড়িত জীবন সর্বদাই নিরাপত্তাহীন। ঠাকুর বড়জোর তাকে পথ দেখাতে পারেন, কিন্তু সে পথে সে যাবে কিনা এটা তাকেই ঠিক করতে হবে। জগন্নাথদেবের যে হাত নেই তা আসলে সংকেতবাহী। অর্থাৎ জগন্নাথ ধরবেন না, তুমি যদি জগন্নাথকে ধরো তাহলে তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

এদেশে মহাপুরুষ জন্মেছেন তো বড় কম নয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলে মানা হয়। প্রশ্ন এই যে, তাহলে এদেশের এত দুর্দশা কেন? এত মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, তীর্থে তীর্থে এত ভক্ত সমাগম, এত নাম কীর্তন, এত ধর্মাচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কেন ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, অবিচার, বঞ্চনা ইত্যাদির শিকার! ঠাকুরের কাছে গিয়েই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল, একটি মানুষের ভিতর কত রকম জটিল ও ভয়ংকর সব বৃত্তিপ্রবৃত্তির প্রকাশ থাকে। আর সেই মানুষকে মেরামত করার জন্য কতখানি মেহনত করতে হয়। ঠাকুর যে কঠোর অনুশাসন প্রবর্তন করেছেন তা এমনি নয়। গুরুগিরি করা তার পেশা নয়। তিনি মানুষের কারিগর।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর দীক্ষা। আর ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সেই তিনি এক রাখাল মানুষ! ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ওই তরুণ বয়সেই প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তির যে প্রকাশ দেখি তা অত্যাশ্চর্য! এত বিদ্যা, এত দূরদর্শিতা, মননের এমন গভীরতা ঠাকুর কবে কখন কীভাবে অর্জন করলেন সেটাই প্রশ্ন। ঠাকুর তো যৌবনকাল থেকে পড়াশোনা বা আলাদা নির্জনবাস করে তপস্যা, এসব কিছুই করেননি। বইপত্র পড়ার সময়ই বা কোথায় ছিল তাঁর? সমসাময়িকদের নানা জনের স্মৃতিচারণায় দেখি ঠাকুরকে নিয়ে ভক্তদের কি আত্যান্তিক টানাটানি। ভক্তের আব্দার রাখতে তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই এখানে সেখানে যেতে হত। আর সারাদিন অগুন্তি মানুষের সঙ্গে কথা না বলে তো উপায় ছিলনা।

সাধুসন্তদের নানারকম পরিক্রমা করতে হয়। মহাপুরুষদেরও দেখা যায় প্রচারকার্যে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে। ঠাকুর কোথাও যেতেননা। সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিতেননা, ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বাস করতেন। বড়জোর কুষ্টিয়া বা ওরকম কাছাকাছি কোথাও, কলকাতা এবং পুরী। ছেলেবেলায় বোধহয় একবার মায়ের সঙ্গে আগ্রা গিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজের প্রচার করতে চাইতেন না এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছুক ছিলেননা বলে অশ্বিনী বিশ্বাস এবং বীরু রায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই দুই ভক্ত ঠাকুরকে প্রচারকার্যে ব্রতী করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর সম্মত হননি বলেই তাঁরা আশ্রম ত্যাগ করেন। ঠাকুর চাইতেন তাঁর শিষ্যবর্গই এমন হয়ে উঠুক যাদের দেখলেই মানুষ আকৃষ্ট হবে। তিনি আড়ালে থাকবেন।

ঠাকুরের এই প্রচারবিমুখতা অশ্বিনী বিশ্বাস বা বীরু রায়ের অসন্তোষের কারণ হলেও ঠাকুরের এই অবস্থানের পিছনে একটি গূঢ় কারণ আছে। সর্বশক্তিমান তিনি তো সব কিছুই পারেন, কিন্তু সেই পারঙ্গমতায় তাঁর লাভ কী? তিনি চান তাঁর ভক্তদের ভিতরে এমন স্ফুরণ ঘটুক যা মানুষকে টেনে আনবে। সেইজন্যই তাঁর ঋত্বিক আন্দোলন। ঠাকুর সব পারেন, কিন্তু আমরা যদি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকি তবে তাঁর মহিমা বাড়েনা। এক বিবেকানন্দ যেমন ভগবান রামকৃষ্ণকে প্রকট করেছিলেন, ঠাকুর ঠিক তেমনটিও চাননি। অত বড় মাপের ভক্ত নয়, ঠাকুর ছোটোখাটো, সাধারণ, অকিঞ্চন, এমনকি অশিক্ষিত মানুষকেই ধীরে ধীরে ঘষে মেজে নিয়েছেন। তাঁর ঋত্বিকদের মধ্যে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব বর্ণের মানুষই আছে। খ্রিস্টান, মুসলমান ঋত্বিকও বহু। কারও ধর্মান্তরও ঘটাননি, বরং মুসলমানকে আরও খাঁটি মুসলমান, খ্রিস্টানকে আরও বেশি খাঁটি খ্রিস্টান করে তুলেছেন।

ঠাকুরের মতো এরকম ধর্মনিরপেক্ষ আগম পুরুষকে আমরা আগে পাইনি। খানিকটা রামকৃষ্ণদেব ছিলেন। ঠাকুর বর্ণাশ্রম মানতেন বলে প্রথমটায় আমার একটু খারাপ লাগত। পরে ভেবে-চিন্তে দেখলাম, জাতিভেদ খারাপ, কিন্তু বর্ণাশ্রম তো জাতিভেদ নয়। এ হল গুচ্ছিকরণ। প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্রই তা রয়েছে। ফল, ফসল,

গরু, ভেড়া, ঘোড়া, উট, সব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে। তাহলে মানুষের শ্রেণিভাগ নেই, এটা তো হতে পারেনা।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিষয়েও ঠাকুরের মনোভাব ছিল অনমনীয়। অকুণ্ঠ মেলামেশা পছন্দ করতেননা, কো-এডুকেশনের বিরোধী ছিলেন, নারী ও পুরুষের একটু ব্যবধান রাখা পছন্দ করতেন, এমনকী সহোদর এবং বাবা ছাড়া মেয়েদের আর কোনও পুরুষের সঙ্গে বাইরে বেরোনো বা উপহার নেওয়া পছন্দ করতেননা। প্রথম প্রথম এসব মতকে বাড়াবাড়ি মনে হত। পরে ভেবে দেখেছি, ঠাকুর কিছুমাত্র ভুল বলেননি। মেয়েদের নমনীয় চরিত্রে খুব সহজেই পুরুষের ছাপ পড়ে যায়। ফলে নানা অঘটন ঘটতেই পারে। অভিজ্ঞতাবশে জানি, নারী-পুরুষের অত্যধিক নৈকট্য উভয়পক্ষেরই পরবর্তী বিবাহিত জীবনে নানা সমস্যা নিয়ে আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমার নানারকম লাগামছাড়া মতামত ছিল। নারী-পুরুষের বিবাহবন্ধন ব্যাপারটাই জানতাম না, যৌন সম্পর্ক অবাধ হওয়া সমর্থন করতাম। যেগুলো ছিল যৌবনের উন্মার্গগামিতার ফসল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু আমি নারীসঙ্গ এড়িয়ে চলতাম। মেয়েরাও আমার দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয়নি। ফলে আমি একটি প্রেমিকা-বর্জিত যৌবন কাটিয়েছি। কোনও মেয়ে-বন্ধুও ছিলনা আমার। যাই হোক, ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পর বুঝলাম, আমার জীবনের লাগামছাড়া চলার অভ্যাসটা বদলে ফেলতে হবে। কাজটা সহজ ছিলনা। কিন্তু ঠাকুরের যে মহিমা আর শক্তির পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য স্বতোৎসারিতই ছিল। এক কৃষ্ণগহ্বর থেকে তিনি আমাকে বাইরে টেনে এনেছেন। সুতরাং তাঁর ওপর নির্ভর করতে আর তেমন দ্বিধা ছিলনা। দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে নতুন অনুশাসনে নিজেকে ঢেলে সাজানো তো সহজ ছিলনা। কিন্তু ভালবেসে করলে সব কঠিন কাজই সহজ হয়ে যায়। এটা বরাবর দেখেছি। ঠাকুরের প্রতি আমার এবং আমার মতো অনেকেরই এক অদ্ভুত ভালবাসা উপজাত হয়েছিল।

প্রকৃত ভালবাসা থেকে মানুষ অঘটন-ঘটন-পটীয়ান হয়ে উঠতে পারে। তবে আমরা যে ভালবাসা সংসার ও বাস্তবজীবনে দেখতে পাই তার মধ্যে আদিখ্যেতা এবং দখলদারী মনোভাবটাই প্রকট। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা এমন যে সেই ভালবাসা একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই ভূমায়িত হয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই ঠাকুর বলেছেন, যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে সে জগৎকে ভালবাসতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রীকে ভালবেসে ব্যক্তি স্ত্রৈণ হয়ে যাবে। বরং অস্যার্থ হল, স্ত্রীকে ভালবাসলে তার ভালর জন্য যদি মানুষ আপ্রাণ হয় তাহলে দেখা যাবে স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সেই ভালবাসা ক্রমে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।

"কখনও তুমি কামের অধীন, কখনও তুমি ক্রোধের অধীন, কখনও তুমি দম্ভের অধীন, কখনও তুমি ঘৃণার অধীন। অন্য পরে কত কথা, তুমি নিজেই ঠিক পাবেনা—কখন তুমি কেমন হয়ে দাঁড়াবে। এর চাইতে পরাধীন আর কি হতে পারে?" ঠাকুরের এই উদ্ধৃতিটি আমি তুলে দিলাম সম্প্রতি প্রকাশিত ভক্তপ্রবর শ্রী প্রভুদাস লীলাধরের পুস্তিকা পুণ্যকথা থেকে। প্রভুদাস বড় যত্নে, বড় অধ্যবসায়ে ঠাকুরের বাণীগুলি থেকে বাছাই কিছু মণিমুক্তো এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। বইটি দেখতেও হয়েছে সুন্দর। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই আমাদের চারপাশে যা আছে, আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে আমাদের খুব একটা সচেতনতা থাকেনা। তেমন ভাবিইনা চারপাশটা নিয়ে। মানুষজন, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, এমনকি জড়বস্তু যা আছে এর সব কিছুই কিন্তু সর্বদা আমার অস্তিত্বকে কোনও না কোনওভাবে সাহায্য করছেই। ঠাকুর পারিপার্শ্বিককে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর বিভিন্ন সময়ের আলাপচারিতায় বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। অতি সামান্য জিনিসের প্রতিও তাঁর প্রখর নজর ছিল। কোথাও সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে তাঁর নজর এড়াতনা। আরও একটা ব্যাপার হল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসঙ্গতিও তিনি লক্ষ্য করতেন কিংবা টের পেতেন। আমরাও দেখি, অনুধাবন করি, কিন্তু তবু কত কিছু আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়েনা। কিন্তু ঠাকুর আমাদের মতো নন। তাঁর কাছে তাঁর পারিপার্শ্বিকের সবটাই স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। একটা মানুষকে দেখলে তিনি তাঁর অতীত ও ভবিষ্যৎও দেখতে পেতেন। ঠাকুরের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে-কেউ এই ক্ষমতার, এই

অতুলনীয় ধী ও ঐশ্বরীক অনুভূতির অধিকারী হতে পারে। তাই মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব হোক, এটাই যেন ছিল ঠাকুরের আকুল চাওয়া।

ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পর আমার নিজের যেসব পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো আমি বুঝতে পারি আমার চারদিকের মানুষজনের প্রতিক্রিয়া থেকে। সেই প্রতিক্রিয়া বড়ই অস্তিবাচক। দীক্ষার আগের জীবনে আত্মীয়স্বজন আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কারও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলামনা। আমার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ছিল তলানীতে। আর এর জন্য আমার কিছুটা আফশোষও ছিল। ১৯৬৫-তে দীক্ষা নেওয়ার পর ধীরে ধীরে দান উল্টে গেছে। আর তার জন্য আমি তো সক্রিয় হইনি। শুধু ঠাকুরের অনুশাসন খানিকটা অনুসরণ করেছি মাত্র।

ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি অনুভব করি লেখালেখির সময়ে। লেখা নিয়ে আমার উত্তুঙ্গ উৎকণ্ঠা আছে। দ্বিধা আছে, চিন্তার সংকট আছে। সবচেয়ে বড় কথা ঠাকুরের কিছু নির্দেশিকাও আছে লেখকদের প্রতি। সব দিক রক্ষা করে সৃজনকর্ম প্রবহমান রাখা কঠিন কাজ।

স্পেনসারদার এক প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, অবতার-মহাপুরুষদের মধ্যে পরমপিতার স্মৃতিচেতনা জ্বলজ্বল করে, সাধারণ মানুষের ভিতর সেই স্মৃতিচেতনা নিভু-নিভু। তিনি ইষ্টাভিধ্যানবতৎপর, উৎস-ঝোঁকা, আত্মারাম। সাধারণ মানুষ বৃত্তি-অভিধ্যান-তৎপর, উৎস-বিমুখ, ইন্দ্রিয়াসক্ত। সেদিক দিয়ে দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। বাইবেলে আছে—I come from above, ye from below।

সুতরাং এই ব্রাহ্মীপুরুষ দেখতে শুনতে আমাদের মতো হলেও তাঁকে পরিমাপ করা সহজ নয়। তার চেয়ে বরং "ঠাকুর" বলে আঁকড়ে থাকা ভাল। মেধা বা গড়পড়তা ধী দিয়ে তাকে বুঝবার চেষ্টা করে আমার তো তেমন কোনও লাভ হয়নি। ঠাকুর দয়া করে আমার কাছে তাঁর যতটুকু বুঝতে দিয়েছেন সেইটুকু বুঝ নিয়েই আমার চলা।

বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদ দিয়ে ঠাকুরের বাণী এবং অনুশাসনকে বোঝা যাবে ঠিকই, কিন্তু করার ভিতর দিয়ে না এগোলে তাঁকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শুধু অনুশাসন মেনে চলা একটা বিশুদ্ধ ব্যাপার। আসল হল অনুশাসন প্রদানকারী মানুষটি, অর্থাৎ ঠাকুর, তাঁকে ভালবাসতে না পারলে অনুশাসন জোয়াল হয়ে দাঁড়ায়।

কি করে গুরুকে ভালবাসতে হয়? ঠাকুর সেই তুক কত কৌশলে যে আমাদের শিখিয়েছেন। তৎচিন্তাপরায়ণ হওয়া, তৎকর্মনিরত হওয়া, তাঁরই ধ্যান ও তাঁরই অনুসরণ—এছাড়া আর পন্থা নেই।

ঠাকুর তাঁর আলাপচারিতায় যেসব কথা বলেছেন তা আজ আমরা বই পড়ে জানতেই পারি। কিন্তু বলার সময় তাঁর দেহভঙ্গি, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর চোখের চাহনি এগুলো তা আর বই পড়ে পাওয়া যায় না! কথাগুলি শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে নিতে হয়। আমি ঠাকুরকে তো খুব বেশিদিন পাইনি। মাত্র চার বছর। তাও সবসময়ে নয়, মাঝে মধ্যে গিয়ে হাজির হতাম। আমার সেই সামান্য দেখাটুকুই অসামান্য হয়ে আছে। একবার তাঁকে দেখলেই ভিতরে কি যেন একটা হত।

ঠাকুর চিরকাল দেহধারণ করে থাকবেননা, এ তো জাগতিক নিয়ম। কিন্তু তবু তাঁর প্রস্থানের পর এত বছরে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের অনেকেরই আফশোষ ঠাকুরকে চাক্ষুস দেখেনি বলে। আমার মনে হয়েছে, ঠিকমতো নিষ্ঠা নিয়ে আকুল হয়ে যদি নাম ও ধ্যান নিয়মিত করা যায় তাহলে তাঁকে চাক্ষুস করা সম্ভব। চাক্ষুসের চেয়েও বেশি কিছু হতে পারে। যাকে বলে স্বরূপ-দর্শন। সেই দর্শন আর কজনেরই বা হয়? আসল কথা হল, যখন তাঁকে চাক্ষুষ করতাম তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের কতটা তফাত তা তেমন বুঝতে পারতামনা। এখন যত দিন যাচ্ছে, যত ঠাকুরকে জানবার বা বুঝবার চেষ্টা করছি, ততই মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রপ্রমাণ তফাত। কারণ, ঠাকুর তো শুধু তত্ত্ববেত্তা নন, তিনি চান রূপায়ণ। বাস্তব কাজের ভিতর দিয়ে, বিরামহীন প্রয়াস ও অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠাকুরের আশি বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে যা করেছেন তা করে উঠতে গড়পড়তা মানুষের কয়েকটা জীবন লেগে তো যাবেই, তাও তার বোধ ফুটে উঠতে না-ও পারে। আবার এসব ভেবে বসে থাকলেও হবেনা। ঠাকুর হতাশা পছন্দ করতেননা।

ঘাত-প্রতিঘাত, সংকট, বিপদ-আপদ, অভাব, অবসাদ—এইসব যখন মানুষকে চেপে ধরে তখনই বোধহয় ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায়। অন্তত আমার জীবনে তো এমনটাই ঘটে। যখন জীবন মসৃণ গতিতে চলে তখন নাম-ধ্যান কমে যায়, ইষ্টচিন্তাও যেন ঘুমিয়ে পড়ে, ঠাকুরকে নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনাও থাকেনা। আর এই ঢিলেমি এলেই বুঝতে পারি, এর পরই একটা বড় রকমের ধাক্কা আসছে। তখন আবার "বাপ রে, মা রে" করে তেড়ে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া উপায় থাকেনা।

বোধহয় গড়পড়তা মানুষের আমারই মতো অবস্থা। এই যে আমাদের আলস্যের প্রবণতা এটাই ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব রচনা করে। ঠাকুর বলেন, ধ্যান চব্বিশ ঘণ্টাই করতে হয়। অর্থাৎ সবকাজের মধ্যে সবসময়েই আজ্ঞাচক্রে তাঁর অবস্থান এবং জপ বা নাম অব্যাহত থাকা চাই। আসনে বসে ধ্যান কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ঠাকুরের ধ্যান যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে একটা তৈলধারার মতো বহমান থাকে তাহলেই সবচেয়ে ভাল হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সারথী হয়ে রথ চালনা করেছিলেন ঠিক তেমনি ঠাকুর অর্থাৎ ইষ্টই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান। সাধু হওয়া বা গৃহত্যাগ করা অথবা গেরুয়া ধরার তেমন প্রয়োজনই নেই। ঠাকুর যেমন বলেছেন, "ডংকা মেরে সংসার করবি আর ব্রহ্মাসিংহাসনে বসে থাকবি"—ঠিক তেমনটাই হয়।

"ধরে দাঁড়াও, ছেড়ে দাঁড়ালে পড়েও যেতে পারো" এটা ঠাকুরের ছোট্ট একটা বাণী। ইষ্টে নির্ভরতা না থাকলে পতন ঘটা বিচিত্র নয়। আর মানুষের পতন খুব সামান্য একটু শিথিলতা থেকেই ঘটতে পারে। আমাদের নানা রিপুর নানা দাবিদাওয়া। বৃত্তি আর প্রবৃত্তি জীবাণুর মতো মন ও চরিত্রকে রুগ্ন করে ফেলে। সাধন-ভজন-ভক্তিতে অনেকটা আগু মানুষও পতনের হাতে পড়ে যান। ঠাকুর তাই সতর্ক করছেন। ধরে দাঁড়াতে বলছেন, ধরে থাকতে বলছেন। ওই হল রক্ষাকবচ। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন বলেই তাঁর দয়া আমাদের মুক্ত করতে সক্ষম, যদি আমরা মুক্তিকামী হই, তবেই।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার ধারণা হয়েছিল গা ছেড়ে চললেও সব হয়ে যাবে। তখন অনেক অলৌকিক ঘটত বলেই বোধহয় ওরকম মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তারপর টের পেলাম ঠাকুর এত সহজে শিষ্যকে রেহাই দেওয়ার পাত্র নন। "কৃপা" মানে যে করে পাওয়া সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিলেন। আরও লক্ষ্য করেছি বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চললে তার ফল কিন্তু ছাড়ে না। শত নামধ্যান বা ব্রত-উপবাস করলেও না। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে যৌন জীবনে কোনও বিকার না ঢোকে, এবং হিংস্রতা যেন আমাদের আশ্রয় না করে।

ঠাকুরের ছায়ায় আমার পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। এতগুলো বছর কেটেছে বলে কিন্তু মনেও হয়না। চোখ বুজে মনঃসংযোগ করলে তাঁর অপরূপ মুখ এবং অপার্থিব দুখানা চোখ আজও জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে। আর মনে হয়, তাঁর আশ্রয় না পেলে জীবনের কোন স্রোত আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তাঁর এক একটা কথা এক এক সংকটে আমার হাত ধরেছে। মনে আছে জীবনের এক ঘোর সংকট ও বিভ্রান্তির সময়ে সত্যানুসরণের একটি বাক্য আমাকে সঞ্জীবিত রেখেছিল। "ধৈর্য ধরো, বিপদ কেটে যাবে।"

"অবতার মহাপুরুষদের ভিতর থাকে এই continuity of consciousness (চেতনার ক্রমাগতি)। তাই তাঁরা অচ্যুত।...জন্ম জন্মান্তর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে তাঁদের সত্তাসেবার অভিযান। অবতার হলেন one white crow (একটি সাদা কাক)। তিনি দেখিয়ে দিয়ে যান, মানুষের কি হতে হবে। মানুষ কি হতে পারে। আর মানুষ তাঁকে ভালবেসে যদি অনুসরণ করে, তাহলে অমৃত লাভ তার পক্ষেও কঠিন কিছু নয়। প্রবৃত্তি-খণ্ডিত আমি-টাই তখন নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে অখণ্ডতার পথে চলে এবং এলোমেলো স্মৃতিচেতনাও সমন্বয় ও সঙ্গতি লাভ করে।" জন্মান্তর, স্মৃতিবাহী চেতনা ও আত্মার অবিনশ্বরতার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন। জন্মান্তর নিয়ে ঠাকুরের শুধু ঔৎসুক্যই ছিলনা, সুশীলদাকে নানা জায়গায় পাঠিয়ে জাতিস্মরদের একটি সারণীও তৈরি করেছিলেন। একজন বিশ্রুত জাতিস্মর ঠাকুরের কাছে এসে দীক্ষাও নেন।

যাঁরা জন্মান্তর মানেননা বা আত্মার অস্তিত্ব কিংবা অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেননা তাঁরাও হয়তো জাতিস্মরদের সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবেননা। অবশ্য এই জাতিস্মরতার ব্যাপারে অনেক জালিয়াতিও হয়েছে। শেখানো পড়ানো জাতিস্মরদেরও অভাব নেই। কিন্তু প্রকৃত জাতিস্মরদের দেখা প্রায়ই মেলে। এ বিষয়ে বিদেশে বিস্তর চর্চাও হয়েছে। সাহেবদের একটা গুণ হল, কোনও বিষয়ে তারা কৌতূহলী হলে তার শেষ অবধি দেখে ছাড়ে। Near Death Experience নিয়ে লেখা বিস্তর বই বেরিয়েছে নানাজনের ব্যাপক গবেষণার ফলে। এ নিয়ে গবেষণা আজও চলছে। ঠাকুরেরও এই ব্যাপারটা ছিল। কোনও বিষয়েই অনুসন্ধান করা ছাড়তেন না। কেউ কিছু বললে উড়িয়ে দিতেন না কখনও। সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্যতার দুটি দিক নিয়েই খোঁজ খবর করতে বলতেন। বই ঘাঁটতে বা অনুসন্ধানে নিয়োগ করতেন।

বহু মানুষই আছেন যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাস করেননা, আত্মা বা পরলোক মানেননা, অলৌকিক বা ভূত বলেও কিছু আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেননা। এই না মানার পিছনে যথেষ্ট জোরালো যুক্তিও আছে। কিন্তু মুশকিল হল যখন নাস্তিকতাও একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। আমি একজন নাস্তিককে চিনতাম যিনি ঈশ্বর বিষয়ক প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়ে পড়তেন অর্থাৎ তাঁর অবিশ্বাসটা প্রায় সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার যারা এসব মানেন তাঁদেরও যুক্তির বড় কম নেই। কিন্তু সেখানেও বিস্তর মানুষ সংস্কারাচ্ছন্ন। এই সংস্কার বা বিশ্বাসও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। সোজা কথা, মনকে খোলা ও পূর্ব ধারণার হাত থেকে মুক্ত রাখা দরকার। নইলে সত্য প্রতিভাত হলেও অর্জিত সংস্কার তা অস্বীকার করতে চায়।

একমাত্র ঠাকুরের মধ্যেই দেখেছি, আস্তিক নাস্তিক তাঁর কাছে সমান। এবং তিনি আদ্যন্ত মুক্তমনা। যা কিছু ঘটে বা শোনা যায় তা স্বীকার বা অস্বীকার না করে, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা থেকে ঠাকুর কখনও বিরত হননি। ঠাকুরের ধর্মই ছিল অস্তিবৃদ্ধি। এবং সেই অস্তিবৃদ্ধির অনুকূল অনুশাসনই ঠাকুরের ধর্ম। আর ওই ধর্মের গোড়ায় রয়েছে ইষ্টানুরাগ, যা না হলে গোটা প্রক্রিয়াই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

এটা খুবই সত্য কথা, সাধারণ মানুষ অস্তিত্বের বিবিধ সংকটে পড়েই ঠাকুর-দেবতা মানতে থাকে এবং গুরু ধরে। অনেকের আবার ঠাকুর-দেবতা নিয়ে বায়ুগ্রস্ততাও আছে। হাজার দেবদেবীর পূজো করে বেড়ায় বা নানা গুরু ধরে মুক্তি খোঁজে। এই অস্থিরতার মধ্যে ধর্মাচরণ নেই।

যাই হোক, গুরুর আশ্রয় নেওয়ার পিছনে আপৎমুক্তির তাড়না থাকেই। সবসময়েই পৃথিবীতে ঠাকুরের গুরু পুরুষোত্তমকে পাওয়া যাবে তা তো নয়। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি বা তাঁর অনুশাসন থাকবেই। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনন্যসাধারণতা হল ঋত্বিক আন্দোলন প্রবর্তন। ঋত্বিক মানে পুরোহিত। এঁরা কোনওভাবেই গুরু নন, গুরু স্থানীয়ও নন। তবে ঠাকুরের প্রতিনিধি এবং আজ্ঞাপ্রাপ্ত দীক্ষাদানাধিকারী। আর ঋত্বিক যে-কোনও বর্ণ বা সম্প্রদায়েরই হোক তার কাছে আবিপ্রচণ্ডাল সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ঠাকুরের কথায় All my ritwiks are brahmins। এই ঋত্বিক প্রথার ফলে ঠাকুর অন্তরালবর্তী হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর কৃপা, দয়া সবই অব্যাহত আছে। শুধু মনে রাখতে হবে ঋত্বিক বা আর কাউকে ঠাকুরের স্থলাভিষিক্ত করা ঠিক নয়। কারণ ঠাকুর বারংবার বলেছেন, নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

এখানে প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলতে হয়। ঠাকুরের সমান বা সমকক্ষ হওয়া একমাত্র পুরুষোত্তমের পক্ষেই সম্ভব। আর ওই ধী, ওই দয়া, ওই প্রেম এবং ওই শক্তি অর্জনসাপেক্ষ নয়। এটা হতে পারে যে তাঁর যিনি একনিষ্ঠ ভক্ত, যিনি তদগতপ্রাণ, যাঁর বিশ্বাস গভীরে প্রোথিত এবং যে সর্বদাই ঠাকুরের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে, তাঁরই চিন্তায়, তাঁরই ধ্যানে, তাঁরই মননে যিনি সর্বদা নিমজ্জিত তেমনতরো মানুষ অনেকটা ঠাকুরের ছায়া হয়ে থাকেন। তিনি ঠাকুরের মতো সর্বশক্তিমান না হলেও ঠাকুরের পন্থায় মানুষকে চালনা করতে পারেন। কিন্তু সেই মানুষ দুর্লভ।

ঠাকুরের সংগঠন বিভক্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সেই বিভাজন নিতান্তই সাংগঠনিক। সংগঠন তো ঠাকুরের ঈপ্সিত ছিলনা। তাঁর আদ্যন্ত লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টি মানুষ। প্রতিটি ব্যক্তি বা অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি ইষ্টমুখী না হয় তাহলে সংগঠনও তেমন কিছু করে উঠতে পারেনা। মন্দির বা বিল্ডিং বানানো এবং উৎসব করে হই-হই

হুল্লোড় করা ছাড়া কাজ আর এগোয়না। কাজেই সংগঠনের ব্যর্থতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। শিষ্যের উচিত ঠাকুরকে হৃদি সিংহাসনে বসিয়ে নাম-ধ্যানে মেতে থাকা এবং যথাসাধ্য ইষ্টকর্ম করা। ঠাকুর কি নির্মমভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন শরীরে থাকবেননা তখন তাঁর ইষ্টভৃতি কোথায় দিতে হবে। সেখানে সংগঠনের কথা নেই। ব্যক্তির কথা আছে। খুঁজে দেখতে হবে তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রকৃত ইষ্টে নিবেদিত প্রাণ কেউ আছে কি না, নইলে তেমন ভক্তকে খুঁজতে হবে শিষ্যদের মধ্যে। সংগঠনকে ইষ্টভৃতি দেওয়ার নিয়ম তিনি করেননি।

ঠাকুর নানাভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, ভালবাসা কোনও ভাবের বা আবেগের ব্যাপার নয়। ভালবাসলে ভালবাসার জনের জন্য কিছু না কিছু করা থাকেই। যেমন সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রত্যাশাহীন, ক্লান্তিহীন সেবা ও করা। সন্তানের সুখ সুবিধা ও নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা। আর ওইভাবেই ভালবাসার বনিয়াদ মজবুত হয়।

মনে রাখতে হবে, গুরুর প্রতি ভালবাসা গজিয়ে তুলতে হলে তাঁর জন্যও বাস্তবভাবে কিছু করতে হয়। আর এই করা কিন্তু নিত্যকর্ম। ঠাকুর মানুষের স্বভাব ভালই জানেন। মানুষ সুখে বা নিশ্চিন্তে থাকলে যে বড় একটা গুরুর জন্য ব্যাকুল হয় তা নয়। বিপদে পড়লে 'ঠাকুর-ঠাকুর' করে হয়তো। যাতে চরিত্রের শ্লথতা ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দিতে না পারে তার জন্যই ঠাকুর ইষ্টভৃতির প্রচলন করেছিলেন। সকালে অন্তত সাধ্যমতো ওই নিবেদনটুকু করলেও গুরুর জন্য কিছু তো করা হল। আর ও থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটুকু অব্যাহত থাকে।

ঠাকুরকে ভালবাসা—এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর তার জন্যই আমাদের যত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নামধ্যান, সদাচার পালন। কিন্তু কঠোর অনুশাসন মানুষ সবসময়ে অনুসরণ করতে পারেনা। সাধারণ মানুষের অত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আর অভিনিবেশ থাকেনা। সংসারে আবদ্ধ জীব তারা, স্বার্থ ও আত্মমুখিনতা সর্বাংশে বর্জন করাও শক্ত। ঠাকুর তাই বলেছেন, আর কিছু না পারিস তো রাতে শোওয়ার সময় দশবার ঠাকুর-ঠাকুর বলে ডাকিস। তাতেও কাজ হবে।

মনে রাখতে হবে, ঠাকুরকে নিজের ভিতর সর্বদাই জাগিয়ে রাখা একান্তই প্রয়োজন। নিরন্তর ঠাকুরের সত্তাকে নিজের ভিতরে অনুভব করা।

আমার মেলাংকলিয়ার নানারকম আক্রমণ আছে। দীক্ষার পর মেলাংকলিয়া উধাও হয়ে গিয়েছিল, পরের প্রায় সতেরো-আঠেরো বছর আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। যদিও জাগতিক কষ্ট বা দুঃখভোগ যথেষ্টই করতে হয়েছে। যেগুলো সওয়া গেছে। দীর্ঘ সতেরো-আঠেরো বছর গিধনীর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর ঘটনাচক্রে ফের যখন দেওঘরে ফিরলাম, তখনই আমার পুরোনো মেলাংকলিয়া ফেরত এল। প্রচুর নামধ্যান এবং দীর্ঘ কয়েক মাসের চেষ্টায় তা কাটল বটে, কিন্তু ওই সময়ে আমার মা প্রয়াত হন। জীবনে সে এক মর্মান্তিক শূন্যতা।

তারপরও নানা রূপ ধরে বিষাদরোগ ফিরে এসেছে। ঠাকুরের নামধ্যানে সহজে কাটেনি তা। কারণ, জীবনযাপনে কিছু গণ্ডগোল পুষে রেখেছিলাম। সেসব থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুক্তি ঘটে। মনে হয়, ঠাকুরের সঙ্গে লেগে থাকলে তিনি ঘাড় ধরিয়ে নামধ্যান করিয়েও নেন। নইলে আচমকা হারিয়ে যাওয়া বিষাদরোগ ফিরে আসবে কেন?

"অমিয় বাণী" বইটি আমার কাছে অনেকদিন পড়ে ছিল। পড়ে ওঠা হচ্ছিলনা। তার কারণ বোধহয় গ্রন্থের লেখক অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস পরম ভক্ত হয়েও শেষ অবধি ঠাকুরের ওপর খানিকটা অভিমান করেই দূরে সরে যান। ভক্তদের আচরণের নানা অভিব্যক্তি ও গূঢ় কারণ থাকতে পারে। আমরা সাধারণ মানুষ তার বিচার করার যোগ্যতার অধিকারী নই। কিন্তু বিশ্বাসমশাইয়ের অভিমানের কারণ ছিল, তিনি ঠাকুরকে নিয়ে প্রচারে বেরোতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর তাতে সম্মতি দেননি। ঠাকুর যথার্থই মনে করেছিলেন, নিজের প্রচারে নিজেই

তিনি গেলে তা গৌরবের ব্যাপার হবেনা। বরং সেই কার্য শিষ্যরা করলেই ভাল। অশ্বিনীদা ঠাকুরের কাছের মানুষ হয়েও সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারেননি।

সে যাই হোক, এই বিতর্কের সমাধান করা আমাদের সাধ্য নয়। কিন্তু একথা বলতেই হবে, "অমিয় বাণী" একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সাতাশ আঠাশ বছরের যৌবনকালের ঠাকুরকে এ গ্রন্থ গভীরভাবে চিনিয়ে দেয়। ওই বয়সের একজন ঝকমকে যুবাপুরুষ কী গভীর দার্শনিকতা, বাস্তববোধ, কাণ্ডজ্ঞান ও অপরিমেয় ধী শক্তির অধিকারী তা এই গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। সম্ভবত ঠাকুরের ওপর লেখা এটিই প্রথম বই।

ঠাকুরের পঁচিশ বছর বয়সে মাতা মনমোহিনী সরকার সাহেবের আদেশক্রমে তাঁকে সৎনামে দীক্ষা দেন। আর তার পরেই ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। ঠাকুর কোনওদিনই অন্যান্য সাধুসন্তদের মতো নির্জনে তপস্যা করেননি। তাঁর আধ্যাত্মিকতার বিকাশ আপনিই ঘটে গিয়েছিল, কায়কল্প বা তপশ্চর্যা ছাড়াই। আর তাঁকে ঘিরে আপনা থেকেই জড়ো হয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞাসু মানুষ। মাত্র ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবা একদিন অশ্বিনীদাকে বলছেন "ভাগবতের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখতে পারেন? লোকে প্রকৃত ভাবটা হারিয়ে ফেলে কেবল লীলা আর রূপকের দিকটা নিয়ে আছে। মুখে বলে নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য লীলা, নিত্য রাস হচ্ছে, কিন্তু তার ভেদ জানে কয়জন? আর, যেটাকে সাধারণত নিত্য বলে, সেটাকেও রূপকথার একটা ছায়ার মতো কল্পনা করে রেখেছে। কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে দৃষ্টি করলেও অনেকটা ভেদ বুঝা যায়। যেমন রাস মানে ধ্বনি, রাস-বিহারী অর্থাৎ রাসে, ধ্বনিতে বিহার করেন যিনি। Creation (সৃষ্টি)-এর sound theory (নাদ সিদ্ধান্ত), শব্দব্রহ্ম এসে পড়ছে নাকি? রাধ-ধাতু অর্থে নিষ্পন্ন করা বুঝায়। রাধা অর্থাৎ যিনি সব নিষ্পন্ন করেন, সেই শক্তি। তিনি আবার ব্রজেশ্বরী। ব্রজ-ধাতু অর্থে গমন করা—গতিশীলা। ব্রজেশ্বরী রাধা অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠা গতিশীলা নিষ্পন্নকারিণী শক্তি, অর্থাৎ আদি শব্দ-ধারা sound current, চৈতন্য ধারা বা spirit current. শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা করছেন, গোপীরা সেই আকর্ষণ-রাজের রাসে-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দিকে ছুটছে—জীবজগৎ তাঁর দিকেই যাচ্ছে। একটু hint (আভাস) দেওয়া রইল; ভাগবত্তাদি দেখে চেষ্টা করলে মাথা খুলে যেতে পারে, আর বোধহয় লিখতেও পারেন।"

এই ধাতুরূপ ধরে শব্দের মূলে বা আদি সত্যে পৌঁছানো এইটে ঠাকুরের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কত কুহক, জটিলতা এবং রহস্যকে যে ঠাকুর এইভাবেই প্রাঞ্জল ও সহজে বোধগম্য করে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

ঠাকুর বলছেন "আমি ইচ্ছে করি যে আপনারা material (জাগতিক) এবং spiritual (আধ্যাত্মিক) work (কার্য) একসঙ্গে সমানভাবে চালান। কেবল জপ, ধ্যান, ভজনাদি নিয়ে চুপ করে বসে থাকা, জগতের উপকারার্থে কোনও কাজ না করা, এ আমার ভাল লাগেনা।"

জগৎকে উপেক্ষা করে যে মুক্তির অনুসন্ধান বৃথা এবং বন্ধ্যা তা ঠাকুর বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন। আর কাজেও করেছেন তা।

যে বিপুল কর্মকাণ্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং, তাঁত, ইটভাটা, কামারশালা, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্পের বন্যা হিমাইতপুর আশ্রমে ঠাকুর বইয়ে দিয়েছিলেন তা অব্যাহত থাকলে সৎসঙ্গ এক বৃহৎ ও বিস্ময়কর শিল্পনগরীতে পরিণত হত এবং টাকারও লেখাজোখা থাকতনা। সৎসঙ্গে তৈরি গেঞ্জির যে বিপুল চাহিদা ছিল তা আমি জানি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ঠাকুর। পাছে আশ্রম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে এবং বিপুল টাকার আমদানি মানুষের জীবনচর্যাকে প্রভাবিত করে সেইজন্যই তিনি শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেই বাড়াবাড়ি সংবরণ করে নেন। শুধু তাই নয়, ওই বিপুল সম্পত্তি ছেড়ে হঠাৎ একদিন প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় দেওঘরে চলে আসতেও দ্বিধা করেননি। যখন এলেন তখন কিন্তু দেশ ভাগও হয়নি বা তার সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। বহু কোটি টাকার সম্পদ পড়ে রইল পিছনে, ঠাকুর দৃকপাতও করলেননা। এমনকি পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলে তাও প্রতাখ্যান করেন। সোজা কথা, অর্থোপার্জনকে ঠাকুর কোনও অগ্রাধিকার দেননি। মানুষ তার অন্তরের সম্পদে বলীয়ান হোক, ঠাকুর তাই চাইতেন।

পরবর্তীকালে দেখা যেত, ঠাকুর ভিক্ষে করছেন অকিঞ্চনের কাছেই, পাশে যে ধনী ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর কাছে নয়। আর ওই সব মানুষের কাছে চেয়ে তাঁদের পারগতাকেই ঠাকুর উস্কে দিতেন। কত শিষ্যকে ভাল চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে নিয়তকর্মী করে দিয়েছেন। ঠাকুরের মুখ চেয়ে এমন অনেকেই কষ্টের জীবন যাপন করেছেন বটে, কিন্তু আনন্দেই থেকেছেন।

ঠাকুর দীক্ষা নেন পঁচিশ বছর বয়সে, আর তার পরেই তাঁর কীর্তন যুগের সূচনা। আর ওই কীর্তন যুগে হিমাইতপুর এবং তার আশেপাশের শহর গ্রামাঞ্চলে ঠাকুরের দিব্য প্রভা এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে লোকে তাঁকে ভগবান বলে মানতে শুরু করে। আর এই পর্যায়েই অশ্বিনী বিশ্বাস, বীরু রায় এবং সুশীলদা—যাঁরা ঠাকুরের প্রায় সমবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা ঠাকুরের আশ্রয়ে আসেন। এঁদের প্রত্যেকেই মোটামুটি শাস্ত্রজ্ঞ, কিছুটা আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন এবং বেশ শিক্ষিত মানুষ। ওই বয়সে ঠাকুরের বেশির ভাগ সময়ই কাটত এঁদের সঙ্গে জীবন-রহস্যের নানা প্রশ্নের আলোচনায়।

ঠাকুরের কার্যকলাপ বা কথাবার্তা এমনিতে হয়তো বাস্তবোচিতই, কিন্তু আমাদের বাস্তববোধের নিরীখে নয়। সোজা কথায় তাঁর অনেক আচরণ আমাদের কাছে ব্যাখ্যার অতীত। প্রথম কথা হল, তাঁর কোনও প্রতিশোধস্পৃহা নেই। কেউ ঠাকুরের সাংঘাতিক ক্ষতি করলেও ঠাকুর উল্টে তার ক্ষতি করা দূরে থাক, বরঞ্চ তার কিসে উপকার হবে তার জন্য উতলা হয়ে পড়তেন। কেউ তাঁকে ঠকালে ঠাকুর অনেক সময়ে জেনে বুঝেই ঠকে যেতেন। সর্বভূতে আত্মবোধ করার যে পরম আমিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন তার জন্যই তাঁর আত্ম-পর বোধও আমাদের মতো ছিলনা। আর এই জন্যই তিনি আমাদের কাছে বিস্ময় এবং ধাঁধা। ঠাকুরের যে কোনও আলাদা আধ্যাত্মিক জীবন নেই তা ঠাকুর নিজেই বলেছেন। নির্জনে, বিরলে বসে তিনি কোনও কঠোর তপশ্চর্যা করেননি। তথাকথিত সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যও তিনি অবলম্বন করেননি। তাঁর আধ্যাত্মিকতায় দেখনদারি ছিলই না। কিন্তু গেরুয়া বা লেংটি লোটা ছাড়াও যে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য সম্ভব তারই বিস্ময়কর মূর্ত দৃষ্টান্ত হলেন ঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেছেন, প্রতি কাজে এবং চলাফেরায় নাম জপ করার গুরুত্ব অনেক বেশি। শুধু নির্জনে ধ্যানস্থ থাকার চেয়েও চলাফেরায় জপ ও ধ্যান অধিক কার্যকর। ঠাকুর নিজেই বলেছেন যে, তিনি সর্বদা তাঁর ভিতরে নামের কম্পন বা ধূন অনুভব করেন। নামময়তাই যে আসল শক্তি সেটা তিনি নিজের জীবনযাপনের ভিতরেই মূর্ত করে তুলেছেন।

আমরা ঠাকুরের মতো নই। তার কারণ আমাদের নানা অভিভূতি রয়েছে। সংসার-বন্ধন, বৃত্তিপ্রবৃত্তির প্ররোচনা, লোভ, যৌনতা, ভয়, দুর্বলতা, বাৎসল্য, ক্রোধ, মোহ সব আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে, নিষ্ঠানিগড় থাকতে দেয়না। অথচ ঠাকুর সংসারী হয়েও আদ্যন্ত বন্ধনমুক্ত। তাঁর কোনও অভিভূতি নেই, পক্ষপাত নেই। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সন্ন্যাসী বৈরাগী নন, কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাঁর বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস তুলনারহিত।

ঠাকুরের প্রদান করা অনুশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সদাচার। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যার তার হাতে খাদ্যগ্রহণ ঠাকুর পছন্দ করতেন না। আরও সতর্কতার প্রয়োজন অন্নগ্রহণে। যার তার হাতে ভাত খেলে কী হয়? অনেকে অনেক কথা বলবেন। বেশির ভাগ আধুনিক মানুষই মনে করেন যে, অন্নগ্রহণে বাছবিচার অর্থহীন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। আমি দেখেছি, যার তার হাতে বাছবিচার না করে অন্নগ্রহণ করলে কিন্তু নিষ্ঠা থাকেনা। অন্য কোনও ক্ষতি বা সংক্রমণ না হলেও খুব সূক্ষ্মভাবে নিষ্ঠায় ঘাটতি আসে। আর নিষ্ঠায় ঘাটতি এলে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াও ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। এটি তত্ত্বকথা নয়, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই জন্যই ঠাকুর অনেককে স্বপাক খেতে বলেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীর হাতেও খেতে নিষেধ করেছেন। এগুলোকে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি ভাবা ঠিক নয়। ঠাকুর বিনা কারণে কিছুই বলতেননা। তাঁর প্রতিটি নির্দেশের পিছনেই গভীর বাস্তববোধ থাকত, কার্যকারণ থাকত, যা সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য নয়।

নিষ্ঠা প্রসঙ্গে পরেশদা, অর্থাৎ ঠাকুরের অন্যতম জীবনীকার পরেশচন্দ্র ভোরার কথা মনে পড়ে। পরেশদা খ্রিস্টান পরিবারের মানুষ। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা পরম ভক্ত খ্রিস্টান এবং দাদারা খ্রিস্টান যাজক। ওইরকম গোঁড়া খ্রিস্টান পরিবারের মানুষ হয়েও পরেশদা ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একসময়ে ঠাকুরের নিয়ত কর্মীও হন। ঠাকুর একদিন তাঁকে ডেকে নির্দেশ দেন স্বপাক খাওয়ার। এই নির্দেশ পরেশদা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করতেন। তবে কখনও সখনও বাইরে টাইরে গেলে গুরুভাইদের বাড়িতে প্রয়োজনে রুটি-তরকারি খেতেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, নিষেধাজ্ঞা শুধু বুঝি অন্ন বা ভাতের ক্ষেত্রেই। কিন্তু একদিন ঠাকুর তাঁকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, পরেশদা কারো হাতে রুটিটুটি খান কিনা। পরেশদা তো অবাক। এটা তো ঠাকুরের জানার কথাই নয়। পরেশদা জিগ্যেস করলেন, আপনাকে কে বলল? ঠাকুর অনির্দিষ্টভাবে বললেন, "ওই তো, ওরাই কয়—" বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, ওসব খাবিনা। ওতে নিষ্ঠা থাকেনা। এরপর থেকে পরেশদা আর ভুল করেননি।

অথচ পরেশদা খ্রিস্টান, কিন্তু বর্ণাশ্রমের নিরিখেও খুব উচ্চ বর্ণের ছিলেননা। তবু তাঁকে বিপ্রের অধিক কঠোর নিয়মের সদাচারে আবদ্ধ করেছিলেন ঠাকুর। কেন, তা আমরা জানিনা। হয়তো পরেশদা টের পেতেন। কারণ তাঁকে নিষ্ঠার সঙ্গেই সদাচারটি বরাবর পালন করতে দেখেছি।

ভাবতে হবে, ঠাকুর কিন্তু সকলের জন্য একরকম নিদান দেননি। কখনও কখনও কাজের কাউকে বিশেষ অনুশাসন প্রদান করতেন, কোনও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যই।

তবে সদাচারের সাধারণ নিয়মগুলো সকলের জন্যই। তার ব্যত্যয় ঘটলে আর কোনও ক্ষতি না হোক, নিষ্ঠা যে উবে যায় তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। নানা কাজে বা আমন্ত্রণে আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, দেশে এবং বিদেশে। তখন স্বপাক খাওয়ার সুবিধে থাকেনা। দু-একদিনের ভ্রমণ হলে ভাত না খেয়ে থাকা যায়, কিন্তু দীর্ঘদিনের মেয়াদে ভাত না খেলে উদরাময় বা আমাশা হয়ে যায়। ফলে খানিকটা অরুচির সঙ্গেই অন্নগ্রহণ করতে হয়। আর তখনই লক্ষ্য করি আমার ইষ্টমুখী চলনে নিষ্ঠার টান পড়ে গেছে। এ একেবারে অবশ্যম্ভাবী।

ঠাকুরের অনুশাসনে এমন অনেক কিছুই আছে যা আধুনিক মানসিকতায় অনেকেই মানতে চাইবেনা। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম, মেয়েদের জন্য যেসব নিয়ম এবং খাদ্যপানীয়তে যে বাছবিচার। কিন্তু মানুষের মন দেখলে তো চলবেনা। মানুষের জন্য যা ভাল তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় কি? তবে এইসব অনুশাসনের পিছনে আমাদের গবেষণাও করতে হবে। নইলে আলটপকা ঠাকুরের কথাগুলি ফিরি করে বেড়ালে লোকে আমাদের ছাড়বে কেন? ঠাকুরও তো তাই চাইতেন। আমরা যেন ঠাকুরের বাণীগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই এবং মাথা খাটাই। আজকাল মানুষ মাছ-মাংস-ডিম ছাড়া ভাবতেই পারেনা। ঠাকুর যে আমিষ আহার পছন্দ করতেননা তারও পিছনে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রয়েছে। কিন্তু লোকে রসনাকে অগ্রাধিকার দেয়। তবু মানুষের কল্যাণের জন্য নিরামিষই যে শ্রেয় তা স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে বোঝা ও বোঝানো দরকার।

"ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময়ে ইষ্টনির্দেশ মূর্ত করাই তপ।" ঠাকুরের এই বাণীটি ছোটো হলেও অতিশয় গভীর। আমাদের তপস্যা যেহেতু ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য নয় বা লোটাকম্বল নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়াও নয়, তাই আমাদের যোগ-সাধনা এই সংসারে থেকেই, এবং সংসারী হয়েই। ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন অর্থাৎ নিয়মিত অভ্যাসযোগে নামের সঙ্গে যুক্ত থাকা। ঠাকুর বলতেন, নিয়ম করে বসতে হয়। চলাফেরা এবং সব কাজে জপ অব্যাহত রাখাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যতই অসুবিধে হোক, নামধ্যান অভ্যাস না করলে জীবন আলুনি হয়ে যায়, বেঁচে থাকাটা একঘেয়ে হয়ে ওঠে। আমরা তো সর্বদাই চাইবো যে, যা আছি তাকে ছাপিয়ে উঠতে। নিজেকে আরও প্রসারিত করতে। নিজেকে যত সম্প্রসারিত করা যায় ততই জীবনে আনন্দ আসে। ঠাকুরের জীবনযাত্রা যেমন, নিজস্ব সংসার থেকেও নেই। তাঁর সংসারে যেন বিশ্বসংসার ঢুকে বসে আছে। আর এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সাহচর্যই তাঁকে উদ্দীপ্ত রাখত। উপভোগের বস্তু বলতে তাঁর কাছে মানুষের সাহচর্য, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালারও

সাহচর্য। আমার ধারণা ঠাকুর শুধু ইহলোকে এই আমাদের ত্রিমাত্রিক বাস্তবতাতেই বিরাজ করতেননা, তাঁর চারদিকে অতীন্দ্রিয় জগৎটাকেও দেখতে পেতেন। দেখতে পেতেন আমাদের আবহের মধ্যেই বিরাজমান আত্মা ও দৈবদেহধারীদের। কখনও সখনও ঠাকুর বলেও ফেলতেন সে কথা। কত বিদেহী তাঁর আশেপাশে বিরাজ করত তা তিনিই একমাত্র বুঝতে বা দেখতে পারতেন। সুতরাং ঠাকুরের বেঁচে থাকাটা আমাদের মতো দৈব বেঁচে থাকা নয়। তাঁর বেঁচে থাকা অনেক বেশি সম্প্রসারিত, তার ব্যাপ্তি আমাদের কল্পনারও অতীত।

ঠাকুরের পরিমণ্ডল শুধু এই ব্যক্ত ও চাক্ষুষ, ইন্দ্রিয়গম্য জগৎকে নিয়ে নয়। ইহলোক, পরলোক তাঁর কাছে একাকার। পরমাণুর নর্তন তিনি তো সেই তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছিলেন, এক বৃষ্টিস্নাত বিকেলে, স্কুল থেকে ফেরার পথে, একটা জঙ্গলের ভিতরে। সৃষ্টির মূলে যে পরমাণুর ক্রীড়া রয়েছে তা তখনই টের পান ঠাকুর। বিরল পুরুষ পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আসেন বলেই তাঁর কাছে সব সত্যই প্রতিভাত হয়। তিনি জগৎ-জীবন-কারণকে যুক্তিসিদ্ধ ভাবেই বোঝেন। তাঁর কাছে জীবনের কোনও রহস্যই অনুৎঘাটিত নয়। বেত্তা ঠাকুরকে চাক্ষুষ দেখেও আমার মনে হত, ইনি সব জানেন এবং ইনি সব পারেন।

জগৎকে দুভাবে দেখা যায়। একটা হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। বিজ্ঞান আমাদের চোখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার নিরিখেই জগৎকে দেখে। বিজ্ঞানের চোখে এই ব্রহ্মাণ্ডে নিবিড় অন্ধকার এবং সীমাহীন, তাতে বস্তুপুঞ্জ গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করছে। বিজ্ঞান জড়বস্তুর ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে গবেষণা ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব রহস্যকে উৎঘাটন করার চেষ্টা করছে। আর একরকমভাবেও জগৎকে দেখা যায়। সেটা হল আধ্যাত্মিক চৈতন্য দিয়ে। বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে। ঠাকুরের নানা কথার ভিতর দিয়ে আমরা এক আনন্দময় অপরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সন্ধান পাই। সেটা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনায় প্রতিভাত হয়না। সেই ব্রহ্মাণ্ডের রূপ আলাদা, অনুভূতি আলাদা। সৃষ্টিরহস্য মানুষ সামান্যই জানে। কিন্তু ঠাকুরের পূণ্য পুঁথি আমাদের সেই জগতের খানিক আভাষ দেয়। ঠাকুরের আলাপচারিতাতেও কখনও সেই জগতের কথা প্রকাশ পেত।

দেহাতীত অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের নানা সংশয় আছে। সাধারণত বৈজ্ঞানিক বিচারে দেহের অতীত কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। বিজ্ঞান মূলতঃ জড়বাদী, তাই তার পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা ধরা পড়েনা তাকে স্বীকারও করা হয়না। কিন্তু জীবনের আশ্চর্য উন্মোচনও আছে। সেগুলো ঠিক ও প্রচলিত বিজ্ঞানের তথ্য মেনে হয়না। তা বুঝতে বিজ্ঞানকে আরও অগ্রসর হতে হবে। অতীন্দ্রিয়কে বুঝতে গেলে অতি-বিজ্ঞানও চাই।

ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, যারা নামধ্যান করতে জীবিত অবস্থাতেই দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে যেতে পারে তাদের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা জীবিত অবস্থাতেই হয়ে যায়, তখন আর মৃত্যুভয় থাকেনা।

ঠাকুরের বাণীর লিপিকার প্রফুল্লচন্দ্র দাস আমাকে একবার তার দেহাতীত অবস্থার কথা বলেছিলেন। শুয়ে শুয়ে নাম করছিলেন, হঠাৎ দেহ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে আর পারিপার্শ্বিককে স্পষ্টই দেখতে পেলেন। নিজেকে দেখে তাঁর বীতস্পৃহা আসে। ঠিক করলেন, দেহে আর ফিরবেননা। তারপর মনে হল, দেহে না থাকলে সাধনার ফল হয়না। তাই কিছুক্ষণ দেহের বাইরে বিচরণ করার পর তিনি আবার দেহে প্রত্যাগমন করেন।

এই ধরনের বিস্তর অভিজ্ঞতা বিদেশেও বহু মানুষের ঘটেছে। এবং তারা কেউ এলেবেলে লোক নন। আমার কাছে গোটা তিনেক ইংরিজি বই রয়েছে যাতে বোঝা যাচ্ছে বিদেশে এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে।

ঠাকুর স্বয়ং জাতিস্মরদের নিয়ে খোঁজখবর করতে সুশীলচন্দ্র বসুকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। সুশীলদা এই নিয়ে একটি বইও লেখেন। দেখা যাচ্ছে সুশীলদা বেশ কয়েকজন জাতিস্মরের সন্ধান পান। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ঠাকুরের কাছেও এসেছেন এবং সাগ্রহে দীক্ষা নিয়েছেন।

নামধ্যানের মাধ্যমে দেহ থেকে ভাবদেহে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা ঠাকুরের শিষ্যদের অনেকেরই হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে তাঁদের তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি।

কিছুদিন আগে আমি এক তরুণ ডেন্টিস্টের কাছে তাঁর অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা শুনি। তিনি অবশ্য আমার পরমার্থ ভ্রাতা নন। একটি জটিল হার্টের অসুখে ভুগছিলেন তিনি। সঙ্কটজনক অবস্থায় একবার তাঁর হার্ট অপারেশনের প্রয়োজন হয়। আর অপারেশনের সময় আচমকাই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। চার মিনিট মৃত অবস্থায় থাকার পর ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর দেহযন্ত্র ফের চালু হয় এবং তিনি বেঁচে ওঠেন। কিন্তু যে চার মিনিট তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন সেই সময়ে তিনি খুব স্বচেতনভাবেই দেখেছিলেন যে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ দিয়ে তিনি দেহের বাইরে বেরিয়ে এলেন। যেখানে পৌঁছোলেন সেটা এক অদ্ভুত আলোকিত জগৎ এবং পরম শান্তি বিরাজ করছে। সেই চার মিনিট তিনি অপার্থিব আনন্দ ভোগ করে ফের যন্ত্রণাময় শরীরে ফিরে আসেন।

এই দেহ এবং দেহাতীত অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের অজস্র প্রশ্ন। প্রভূত কৌতূহল এবং গভীর রহস্য। মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের নানা প্রশ্ন এবং সংশয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া এসব প্রশ্নের মীমাংসা নেই। ঠাকুর তাই বলেছেন দেহাতীত অবস্থার অভিজ্ঞতা ঘটলে মানুষের আর মৃত্যুভয় থাকেনা। রহস্যের মীমাংসা হয়। আর এটা সম্ভব শুধু নামধ্যানের ভিতর দিয়েই।

নিজের বাল্যবন্ধু এবং পরবর্তীকালে শিষ্য অনন্ত মহারাজকে দিয়ে ঠাকুর বিস্তর সাধনা করিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রথম যুগের শিষ্যদের কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে দীক্ষা দেননি। তাঁদের দীক্ষা নিতে পাঠিয়েছিলেন বাঁকুড়ার ঠাকুর হরনাথের কাছে। অথচ ঠাকুর হরনাথকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেননা। চাক্ষুষ পরিচয়ই ছিল না। তবু কেন ঠাকুর হরনাথের কাছেই অনুচরদের দীক্ষা নিতে পাঠাতেন সেই প্রশ্নেরও কোনও জবাব নেই। অবশ্য ঠাকুর হরনাথ বয়সে ঠাকুরের চেয়ে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুরের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যাই হোক, অনন্ত মহারাজ ঠাকুরের নির্দেশে সাধন ভজনে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন। দিনের পর দিন টানা ঘরের বন্ধ করে তপস্যা করতেন। মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে ঠাকুরকে তাঁর নানা উপলব্ধির কথা বলতেন। দিনের পর দিন মৌনীও থাকতে হত তাঁকে। ঠিক এরকমটা ঠাকুর কিন্তু আর কাউকে দিয়ে করাননি। দিনে কয়েক ঘণ্টা সাধনভজন বা নাম-ধ্যান অবশ্য প্রায় সবাই করতেন।

ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যই হল, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা নয়। কাকে দিয়ে কী করাবেন সেটা তিনিই ভাল জানতেন। কূট-কৌশলী হিসেবে তাঁকে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার অন্য দিকে ছিলেন শিশুর মতো সরল, মাটির মতো সহনশীল। সমবয়স্ক বা বয়সে বড় শিষ্যদের সঙ্গে বয়স্যের মতো মিশতেন। একসঙ্গে স্নানাহার, এক শয্যায় শয়ন, তবু শিষ্যরা তাঁকে দেবতাজ্ঞান করত। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ, বয়স্যোচিত মেলামেশাতেও ঠাকুরের দেবত্বের কোনও হানি হতনা। বরং দিনে দিনে তাঁর মহিমা নিকটজনদের কাছে আরও বেশি করে প্রতিভাত হত। ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস আর নির্ভরতা সম্বল করে শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তার সীমা-সংখ্যা নেই। অথচ ঠাকুরের তখন নিতান্তই ছোকরা বয়স। প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বিশেষ করেননি, তেমন দেখনদারী সাধন-ভজনের বালাই ছিলনা। সাদামাটা পোশাক, সাদামাটা জীবন-যাপন। শুধু অসাধারণ হল ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্ব মানুষকে দূরে ঠেলে দিত না, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত।

ঠাকুরের প্রথম যৌবনের এই সময়টাকে কীর্তনের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তখন ঠাকুর কীর্তনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কীর্তনের মহিমা প্রচারও করা হয়েছিল ব্যাপকভাবে, যেমনটা শ্রীচৈতন্য করতেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঠাকুর কিন্তু কীর্তন, ধ্যান ইত্যাদি হ্রাস করে সংগঠনের দিকে শিষ্যদের অভিমুখ করান। কীর্তন ও নামধ্যানে জমি প্রস্তুত হয়েছিল, এবার প্রয়োজন হল সেই মজবুত ভিতের উপর কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন।

হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র তো একটা নয়, বহু। কিন্তু সব শাস্ত্রেরই মূল সুর হল কর্ম এবং কর্ম। কর্ম ছাড়া যে ধর্ম অর্থহীন তা শাস্ত্রকাররা ভালই জানতেন। ঠাকুর সেই সুরেরই নবীন প্রবক্তা। তবে ধর্ম ও কর্মের মিশ্রণকে এত সুন্দর মিশিয়েছেন এবং তা এতই সহজসাধ্য করে দিয়েছেন যার তুলনাই নেই। ব্রহ্ম থেকে সন্ন্যাস,

বৈরাগ্য থেকে ভোগ, মোক্ষ বা কাম সবকিছুই এই প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন যে আমাদের আর ধন্দ থাকেনা। মাতা মনমোহিনী দেবী আগ্রার সৎসঙ্গী ছিলেন। ঠাকুরের দীক্ষাও সেখানেই। যদিও নাম দিয়েছিলেন মাতা মনমোহিনী সরকার সাহেবের নির্দেশে। তবু ঠাকুর যে আগ্রা সৎসঙ্গের মতাদর্শ থেকে সরে আসেন তার কারণ, সনাতন ধর্মের অনুশাসনবাদ থেকে আগ্রা সৎসঙ্গ কিছুটা সরে গিয়েছিল। তবে অন্য কোনও গূঢ় কারণও থাকতে পারে, যা শুধু ঠাকুরই জানতেন। তবে ভিন্ন সংগঠন করলেও আগ্রা সৎসঙ্গ সম্পর্কে তাঁর কোনও বিরাগ কখনও প্রকাশ পায়নি বা কখনও কোনও সমালোচনাও করেননি। এমনকি একবার আগ্রার এক গুরুভাই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে অতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করেন এবং ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শোনেন। সেই সময়ে ঠাকুরের অতি উৎসাহী কয়েকজন ভক্ত হঠাৎ বিনতি প্রার্থনা শুরু করায় ঠাকুর খুব বিরক্ত হন। কারণ এই ঘটনায় ওই গুরুভাইটির অহং আহত হয়েছিল।

শ্রদ্ধা ঠাকুরের সহজাত। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মতামত, প্রত্যেক গুরু বা অবতার, এমনকী জীবজগতের হেন প্রাণী নেই যার প্রতি ঠাকুর সশ্রদ্ধ ছিলেননা। এমনকি নিজের শিষ্যদের প্রতি তাঁর প্রেম বা অনুরাগও ছিল শ্রদ্ধা মেশানো। এই শ্রদ্ধারূপ সম্পদে তিনি আমাদেরও বলীয়ান করতে চেয়েছেন। হিমাইতপুরে একবার তাঁর প্রতিটি শিষ্যকে নিজের হাতে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়েছিলেন ঠাকুর এবং অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। অনেক শিষ্য পাপের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের এই শিষ্যদের পদপ্রক্ষালনের বিষয় গভীর প্রেম আর শ্রদ্ধার সহাবস্থান দেখতে পাই।

আমি যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, সেই ১৯৬৫ সালে, তখন যে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করে বিস্মিত হই তা হল ঠাকুরের অকুণ্ঠ দীনতা, আর দ্বিধাহীন শ্রদ্ধাবোধ। তাতে কৃত্রিমতা নেই, খাদ নেই। তখনও তো ঠাকুরের মহিমা জানা নেই, তিনি খাঁটি না ভণ্ড সে বিষয়েও স্থিরতা নেই, তবু প্রথম দর্শনেই মনে হল, পৃথিবীর কোনও পাপ এঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। আমার আবিল সংস্কারে আচ্ছন্ন চোখেও ঠাকুরের এই রূপই আমি দেখেছিলাম।

সাধারণের মধ্যে থেকে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন ঠাকুর। কিন্তু সত্যানুসরণে ঠাকুরের বলা আছে যে যেমন মন নিয়ে যায় সে ঠাকুরকে তেমনই দেখে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন হৃদয় আর কজনের আছে। কিন্তু আমি যে সময়ে ঠাকুরের কাছে প্রথম যাই সেই সময়ে আমার মন অবসাদে ভারাক্রান্ত ছিল বলেই বোধহয় ঠাকুরকে একটু অন্যরকমভাবে দেখেছিলাম। তখন মন অহংশূন্য ছিল, অন্তরাসি ছিল।

তখন আমি মহাত্মা গান্ধী রোড আর রামমোহন রায় সরণীর (আমহার্স্ট স্ট্রিট) সংযোগস্থলের কাছে এক নম্বর নবীন পাল লেনের ছোটো একটি বোর্ডিং-এ থাকতাম। রাস্তার পাশেই ঘর। সেই ঘরে সকাল থেকেই জনসমাগম হত। কারণ আরও দুজন বোর্ডার ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, খাবার খুব খারাপ। সুবিধের মধ্যে কফি হাউস এবং কলেজ স্ট্রিট খুব কাছে। ওই গণ্ডগোল আর জনসমাগমের মধ্যেই আমাকে লেখালেখি করতে হত। একখানা টেবিল থাকলেও চেয়ার ছিলনা। আর টেবিলও জিনিসপত্রে বোঝাই থাকত। তাই লিখতাম বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে।

ওই সময়েই আমার মানসিক অবসাদ দেখা দেয় এবং আমি ঠাকুরের আশ্রয় নিই। ওই যে ওই জায়গাটা থেকেই আমার ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল তাই ওই জায়গাটির প্রতি আমার খানিক কৃতজ্ঞতাও আছে। কৃতজ্ঞতা আমার মানসিক অবসাদকেও জানানো উচিত। কারণ অবসাদ না এলে আমি কি আর ঠাকুরের কাছে পৌঁছোতে পারতাম?

আবার এও প্রশ্ন ওঠে, ঠাকুরের কাছে কি সত্যিই পৌঁছেছি? নাকি এখনও ঠাকুর বহুদূর! অন্তত এটুকু বুঝি, যেরকম হলে ঠাকুরের মনমতো হওয়া যায় তা তো আর হওয়া হয়নি। সাহসী, লড়াকু, ক্লেশসুখপ্রিয়, বিশ্বাস-নির্ভরতা-আত্মত্যাগ সম্পন্ন বীর মানুষ হওয়া হয়নি। চারচৌখস, কর্মতৎপর ইষ্টাবেগ সম্পন্ন মানুষ হওয়া সহজও তো নয়।

নিজেকে ছেড়ে যখন গুরুভাইদের দেখি তখনও খুশি হতে পারি কই? কারও এক দিকটা ভাল তো অন্য দিক খারাপ, কারও আবার ভাল খুঁজে পাওয়া দায়। একজন বহু পুরোনো মানুষ, ঠাকুরের লীলাসঙ্গী এবং যোগানদার, বিশ্রুত ভক্তের একটা লেখায় তাঁর ইষ্টভৃতি জমা দেওয়ার রোজনামচা পড়ে অবাক হই। এত পুরোনো ঋত্বিক, তবু ঋত্বিক বইটি খুলে তিনি কি দেখেননি ইষ্টভৃতি কিভাবে জমা দিতে হয়!

বিলাপ করা বৃথা। ধরে নিতে হবে আমরা সকলেই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা নিয়েই জীবনযাপন করছি। সম্পূর্ণ একমাত্র ঠাকুর।

কিন্তু তবু প্রাণপণে তাঁর অনুশাসনগুলিকে নিজের জীবনে ফলিত করে তুলতে চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুরের ইষ্টভৃতি নিয়েই এত ধাঁধা আছে, এত জটিলতা তৈরি হয়েছে যে বুঝে উঠতে বহু সময় লেগে যায়। কবে পাঠাতে হবে, কীভাবে পাঠাতে হবে, কাকে বা কোথায় পাঠাতে হবে এ নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই। আবার ঠাকুরকে জিগ্যেস করা হলে, তাঁর দেহান্তের পর ইষ্টভৃতি কোথায় পাঠাতে হবে তা নিয়ে মাত্র দুটি বিকল্প দিয়েছেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইষ্টপ্রাণ কেউ থাকলে তাঁকে, নইলে শিষ্যদের মধ্যে অনুরূপ কাউকে পেলে, তাঁকে। সংঘের কথাই নেই। সুতরাং এখানেও ঠাকুর আমাদের এক বিশাল জিজ্ঞাসার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। আবার ইষ্টভৃতি করার সময়েও ঠাকুরের সঙ্গে যোগযুক্তি না ঘটলে সেই ইষ্টভৃতি সার্থক হয় না। এই যোগযুক্তি রোজ সংঘটন করা বড় সহজ কাজ তো নয়।

ঠাকুরের অনুশাসনে মা-বাবার স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ওইখানে ফাঁক বা ফাঁকি থাকলে ইষ্টপ্রাণ হওয়ার উপায় নাই। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তিকে ঠাকুর অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কারণ ভক্তি আর নিষ্ঠার ওটাই প্রথম পাঠ। আর ভালবাসা ও ঈশ্বরপ্রেমের শুরুও ওই মা-বাবা থেকেই। ঠাকুরের একটা বাণী হল, মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতী তত। যে ছেলে মাকে ভালবাসে সে অকৃতী থাকেনা, এটা বড় ঠিক কথা। তা বলে এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, কৃতী হলেই সে মাতৃভক্ত হবে। তবে ভেবে দেখতে হবে ঠাকুর কৃতী বলতে কি বুঝিয়েছেন। অর্থোপার্জন, পদগৌরব, যশ প্রতিষ্ঠা না কি অন্য কিছু? যে সত্য কথা বলে, সদাচরণ করে, যে সেবাপরায়ণ, দয়াবান, সাহসী, বিনয়ী, নিরহঙ্কার সে কি এইসব গুণের জন্যই কৃতী নয়? ঠাকুর বোধহয় অর্থনৈতিক সফলতাকেই কৃতিত্ব বলেননি। মাতৃভক্ত ছেলের ভিতরকার গুণ আপনি বিকশিত হয় বলেই সে যে কোনও কাজেই কৃতকার্য হয়। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে।

ঠাকুর নিজে খুব "মা-মা" করতেন, এমনকি পরিণত বয়সেও। মাতা মনমোহিনী প্রয়াত হওয়ার পর ঠাকুর এতটাই ভেঙে পড়েন যে বিহ্বলতা তার শরীরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। মা ছাড়া যেন কিছুই বুঝতেন না তিনি। মা যেন ছিলেন তাঁর সর্বস্ব। মায়ের আদেশ কদাচিৎ অমান্য করেছেন, মায়ের সাধ আহ্লাদ প্রায় সবই পূরণ করার চেষ্টা করেছেন।

আর মাতা মনমোহিনীও তো সামান্য নারী ছিলেন না। যেমন তাঁর মায়া-মমতা, তেমন তাঁর তেজ। আবার অন্য দিকে তেমনই ভক্তিমতি, গুরুগতপ্রাণ। আর তা তাঁর বাল্যকাল থেকেই। গুরু হিসেবে হুজুর মহারাজকে লাভ করার অনেক আগে থেকেই তিনি গুরু খুঁজতেন। অবশেষে স্বপ্নে হুজুর মহারাজদের দেখা পান। সে অন্য ইতিহাস। ওই সৎনামের সূত্রেই ঠাকুর মাতা মনমোহিনীর গর্ভে জন্ম নেন বলেই অনুমান।

ঠাকুরের লীলার প্রথম দিকে মাতা মনমোহিনীই ছিলেন আশ্রমের কর্ণধার। সৎনামও তিনিই দিতেন। আশ্রমের নিরাপত্তা, শৃংখলা, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সবই তিনিই সামলাতেন। তেজী, অতন্দ্র, নিরলস, কঠোর পরিশ্রমী, পক্ষপাতশূন্য ও আত্মত্যাগের জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন তিনি। স্নেহে কোমল, শাসনে কঠোর এক অনন্য প্রশাসকেরই ভূমিকা ছিল তাঁর। তাঁর ছত্রছায়ায় এসে কত মানুষ যে জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মা এতটা দায়িত্ব নেওয়ায় ঠাকুর নিশ্চিন্তে এখানে সেখানে যেতে পারতেন, শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার অবকাশ পেতেন, উদ্বেগ পোহাতে হত কম। কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রাণভোমরা। ঠাকুরের চৌম্বক আকর্ষণেই মানুষ দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসত এবং দুর্বিষহ কষ্টের মধ্যে, একবেলা খেয়ে, মাঠেঘাটে শুয়ে দিন কাটাত। কিন্তু তবু ঠাকুরকে ছেড়ে গৃহের আরামে তারা ফিরে যেতে চাইত না। সুশীলচন্দ্র বসু

ঠাকুরের সমবয়সীই ছিলেন। ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর লোভনীয় অধ্যাপনার পদ উপেক্ষা করে, সংসার ছেড়ে ঠাকুরের কাজে চরকি পাক দিয়ে বেড়াতেন। ঠাকুরের নির্দেশে কত যে কঠিন কাজ উদ্ধার করেছেন তা লেখা আছে তাঁর গ্রন্থে। বিবরণ পড়লে অবাক মানতে হয়। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও নির্ভরতা কোথায় পৌঁছোলে এমন কাজ করা সম্ভব।

ঠাকুরের স্বরূপ বা মহিমা খানিকটা বোঝা যায় তাঁর ভক্তদের দেখলে। ভক্তরা কেউই বিখ্যাত বা যশস্বী নন, কেউ বিবেকানন্দর মতো খ্যাতি অর্জন করেননি, বরং নিঃশব্দে নীরবে ঠাকুরের আদেশে অসম্ভব সব কাণ্ড সমাধা করেছেন। তাঁদের সম্বল বলতে কানাকড়ি ছিল না, শুধু চেয়েচিন্তে, লোককে যাজন করে এবং ঠাকুরের ওপর নিঃশেষে নির্ভর করেই তাঁরা অঘটন ঘটিয়েছেন। ঠাকুরের সম্মোহক আকর্ষণ, তাঁর ব্যক্তিত্বের মধুর প্রকাশ, তাঁর অকাট্য কথা আর স্নিগ্ধ চাহনি ভক্তদের ভিতরে এমন এক ভাবের উদ্দীপনা ঘটাত যা সংসারে অন্যত্র অলভ্য। তাই সংসার ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে, ব্যবসা লাটে তুলে মানুষ এসে তাঁর চারপাশে জড়ো হত। খাওয়ার সংস্থান নেই, শোওয়ার জায়গা নেই, তবু কুছ পরোয়া নেই ভাব। আর এই জন্যই ঠাকুরের আশ্রমকে লোকে বলত "মধুচক্র"।

ঠাকুর খুব অল্পবয়সেই খ্যাতি পেয়েছেন তাঁর ওই অজ পাড়াগাঁয়ে বিপুল কর্মকাণ্ডের জন্য এবং অলৌকিক ঘটনার জন্যও। কীর্তন যুগে নানা ঘটনাই ঘটত যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। ঠাকুর-শিষ্যরাও নানা অশৈলী কাণ্ড করে ফেলতেন। কিন্তু প্রকৃত অলৌকিক বলতে গেলে বলতে হয় ওই পাড়াগাঁয়ে অকিঞ্চন অবস্থাতেও ঠাকুর যা গড়ে তুলেছেন। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, বিজ্ঞান গবেষণা, কৃষিক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, আপন পর নির্বিশেষে লোকসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, মহিলাদের কর্মনিরতি—সে এক অফুরান কর্মযজ্ঞ। অথচ ভাঁড়ে মা ভবানী। চিরকালই ঠাকুর বলে এসেছেন, মানুষই তাঁর সম্পদ। মানুষ যে কত বড় সম্পদ তা ঠাকুর আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়েও ছিলেন।

ঠাকুরের চিরকালই একটা করে ঘনিষ্ঠ বলয় ছিল। আগে, যখন ঠাকুর যুবক বা প্রৌঢ় ছিলেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন বা কাছাকাছি যাওয়ার কোনও তেমন বাধা ছিলনা। তাই ঠাকুরের কাছাকাছি অনেকেই যেতে পেরেছিলেন। বিস্ময়ের কথা হল, এঁদের মধ্যে কয়েকজন কট্টর বামপন্থী, নকশাল এবং নির্জলা নাস্তিকও ছিলেন। তাঁরা সবাই যে দীক্ষা নিয়েছিলেন এমন নয়। এঁদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। একজন তো আমার বাড়িতে এসে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঠাকুরের প্রসঙ্গে কথা বলেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন অতি ব্যস্ত মানুষ। আর ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর যে কী শ্রদ্ধা আর আপ্লুত আবেগ! বুঝতে অসুবিধে নেই যে, যে কোনও সংবেদনশীল মানুষই ঠাকুরের সংস্পর্শে এলে এবং সঙ্গ করলে চমৎকৃত হতেনই। তাঁকে উপেক্ষা করার উপায় কারোই ছিলনা। এমনকি ষণ্ডাগুণ্ডারাও তাঁর কাছে শান্ত হয়ে যেত। ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই একটা সম্মোহনকারী যাদু ছিল। সেটা আমি বড় অমোঘ টের পেয়েছি।

ব্যক্তিত্বের এই চৌম্বক আকর্ষণ আবার তাঁর শত্রুও সৃষ্টি করেছিল বড় কম নয়। তৎকালে হিমাইতপুরের বিশিষ্টজনেরা নিজেদের গুরুত্ব হারানোর ভয়ে তাঁর অপযশ করায় ব্রতী হয়েছিলেন। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পরশ্রীকাতর বাঙালীর এটা স্বভাবসিদ্ধ আচরণ। আর ঠাকুর যেহেতু অপার ক্ষমাশীল ছিলেন, নানাভাবে বিপন্ন হয়েও পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেননা সেইহেতু তাঁর ভোগান্তিও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু যা ভাল ও শুভ বলে মনে করতেন তা থেকে ঠাকুর কখনোই শিষ্য বা ভক্তদের বিচ্যুত হতে দেননি।

আধুনিক মানসিকতা ও সভ্যতার অধুনা প্রবণতার নিরিখে ঠাকুরকে অনেকটা প্রাচীনপন্থী এবং গোঁড়া বলে মনে হবে। ঠাকুর রক্ষণশীলতা পছন্দ করতেন। কারণ রক্ষণশীলতাই মানুষকে রক্ষা করে। প্রগতি বলতে বিচারবোধহীন, চিন্তাশীলতাহীন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন ভেসে যাওয়া নয়। তাতে আখেরে পস্তাতে হবেই। আমার বন্ধুদের মধ্যে আরো দেখেছি মদ্যপান বা নারীসঙ্গকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিতে। মদ্যপান থেকে খানিকটা অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায় বটে কিন্তু ধীরে ধীরে আয়ুক্ষয় হতে থাকে। মদ্যাসক্তি একজন সৃজনশীল মানুষের সৃষ্টিকার্যে কোনও সহায়তাই করেনা, বরং শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে

তোলে। ঠাকুর এসব ব্যাপারে আপস কখনো করেননি। ধর্ম মানে হল টিকে থাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়া বা বিকশিত হওয়া। যে অভ্যাস, আচরণ বা সংস্কার অস্তি-বৃদ্ধির বিরোধী তা নির্মমভাবে ত্যাগ করাই ধর্মাচরণ।

যে যত প্রতিভাধর বা সৃজনশীল উপাদানের অধিকারী হোক না কেন, তার শরীরই ওই প্রতিভার আধার। শরীর নড়বড়ে হলে তার প্রতিভাও বিচ্ছুরিত হতে পারে না। তাই যারা শরীরকে নানা অনিয়মে ফেলে দেয় তারা তত বড় আহাম্মক। প্রতিভায় বিশাল মাপের মানুষের অকাল পতন আমরা অহরহ দেখছি। কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নিচ্ছি না। ঠাকুর অস্তি-বৃদ্ধির অনুকূল জীবনযাপনকে ধর্ম বলতেন। আর প্রকৃত ধর্মও তো তাই-ই। সুতরাং কেউ যদি অস্তি-বৃদ্ধির নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করে তবে নাস্তিক হয়েও ধার্মিক। ঠাকুর এই অস্তিবাচক এবং জীবনমুখী, পূরণমুখী, বিকাশমুখী দর্শনেই আমাদের দীক্ষিত করেছেন।

"ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময়ে ইষ্টনিদেশ মূর্ত করাই তপ।" ঠাকুরের এই ছোট্ট বাণীটি যতটা সরল ততটাই গভীরতার দ্যোতক। এটুকুর মধ্যেই যেন ঠাকুরের জীবনদর্শনটা অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে। ঊষা নিশা অর্থাৎ সন্ধিসময়ে ধ্যানাদি করা প্রশস্ত। ওই সময়ে মানুষের মন অনেকটা বিষয়-নিযুক্ত থাকে, তাই তখন ধ্যানে বসলে ইষ্টের প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় হতে থাকে। আর চলাফেরায় জপ, যান্ত্রিকভাবে হলেও, নামের ধূন একজন মানুষকে ঘিরে থাকে। তার ভুলত্রুটি কম হয়, কর্মপ্রবণতা, গতি ও শক্তি বাড়ে। আর ইষ্টনিদেশ অর্থাৎ ইষ্টের ঈপ্সিত কাজ সমাধার জন্য তৎপর হলে জীবনের প্রকৃতিই পাল্টে যায়। সামনে সম্ভাবনার পথও উন্মুক্ত হয়। "ঠাকুরের কাজ" কথাটার পরিধি বিশাল। জীবনমুখী, অস্তিমুখী, বর্ধনমুখী সব কাজই তো ঠাকুরের কাজ। ধী-শক্তিকে জাগ্রত রেখে নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বিকের ভিতরে সেই অস্তি ও বৃদ্ধিমুখী প্রবণতা বা সম্ভাবনাগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার বিপরীতধর্মী যা-কিছুকে প্রতিরোধ করাই তো ঠাকুরের ঈপ্সিত কাজ। আর ধর্মও তো তাই।

জীবনযাপন একটা গুরুতর বিষয়। জীবনযাপনের ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষই ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছা, ব্যক্তিগত চাহিদার ওপর নির্ভর করতে চায়। জীবনযাপন করার জন্য যে একটা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণও দরকার তা অধিকাংশ মানুষই মানতে ইচ্ছুক নয়। ফলে জীবনযাপনের নানা প্রমাদ ঘটতে থাকে। ঠাকুর তো আমাদের তথাকথিত ধর্ম শেখাতে আসেননি, প্রকৃত জীবনযাপনই শেখাতে এসেছেন। জীবন আনন্দময় না হলে, শরীর বিদ্রোহ করলে, বাক্য, আচার ও আচরণে সংযম না থাকলে দিনগত পাপক্ষয় হতে পারে, কিন্তু জীবনযাপনের মজা উপভোগ করা সম্ভব নয়। যেমন খুশি বেঁচে থাকা তো মানুষের ঈপ্সিত হতে পারেনা, ঠাকুর তাই ধর্মোপদেশ দিয়েই তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে দেননি, অনুশাসন আরোপ করেছেন। অনুশাসন ছাড়া জীবনের নৌকো কিন্তু দিশেহারা হতে বাধ্য।

ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করার আগে আমি যে জীবনযাপন করেছি আজ তার বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি, কতটা ছন্নছাড়া এবং উদ্দেশ্যহীন ছিল দিনযাপন। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, লোকব্যবহার, সংযম ইত্যাদির বালাই ছিলনা। তখনও আমি লিখতাম এবং একটু আধটু নামও হচ্ছিল, কিন্তু চিন্তাভাবনার কোনও বিন্যাস বা পরম্পরা ছিল না। খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও বাছবিচার ইত্যাদির তো প্রশ্নই নেই। তবে মহিলা-ঘটিত ব্যাপারে আমি ভীতু ছিলাম বলে তেমন এগোতে পারিনি। বহু বান্ধবেরা হামেশা গণিকালয়ে যেত, আমি কখনোই যাইনি, কেমন যেন অশুচি মনে হত ব্যাপারটা। আর মদ্যপানের নেশা ছিলনা, কারণ পকেটে রেস্ত নেই। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা খাওয়ালে খেতাম।

ঠাকুরকে জীবনে গুরুপদে বরণ করার পর আচমকাই জীবনটা পাল্টি খেয়ে গেল। অত নিয়মকানুন বুঝতে এবং মানতে একটু সময় তো লাগবেই। কিন্তু মুস্কিল হল, আমার সঙ্গে সঙ্গেই, সাত আটদিন আগে পরে যারা দীক্ষা নিয়েছিল অর্থাৎ প্রসূণ মিত্র এবং চন্দন মজুমদার, দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই নিয়মকানুন তেমন মানতনা। চন্দন তো ইষ্টভৃতির পয়সা ভিখারিকে দিয়ে দিত। প্রসূন কখনও ইষ্টভৃতি করত, কখনও করতনা। পাঠাত কিনা তা জানিনা। কারণ দীক্ষা নেওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই সে আমেরিকা চলে যায়। আর

আমাদের ঠাকুরের কাছে যে নিয়ে গিয়েছিল সেই শশাঙ্কর জীবনও খুব মসৃণ পথে প্রবাহিত হয়নি। শশাঙ্কর আবেগ এবং প্যাশন ছিল প্রবল, কিন্তু নিষ্ঠা ধরে রাখার ধৈর্য ছিলনা।

আমার কিছু পরেই দীক্ষা নেয় কল্যাণ চক্রবর্তী এবং মুকুল গুহ। কল্যাণ অবশ্য মোটামুটি অনুশাসন মানত, মুকুলও মানত। তবে মুকুল খুব একটা দেওঘরে যেত না। বড় চাকরি করত বলে ব্যস্তও ছিল খুব। আর মুকুলের একটা গুণ লক্ষ্য করেছি। কোনও জিনিস সে বেশ পরিষ্কার বুঝত। অনুধাবনের ক্ষমতা ছিল খুব। তবে তার জীবন তেমন সমস্যা কণ্টকিত ছিলনা বলে খুব বেশি "ঠাকুর, ঠাকুর" করত না।

ঠাকুরের কাছে যারা গেছে, তাঁর মহিমা বুঝতে পেরেছে এবং আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারা সকলেই যে নিয়মনিষ্ঠ হবে এমন তো নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আলাদা, অনুভূতির তারতম্যও আছে, প্রবৃত্তির তাড়নারও কমবেশি আছে। তাই নিষ্ঠাগত নিরতিরও তারতম্য ঘটে। কিন্তু আমার ধারণা, সকলেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঠাকুরের দয়া পায়। কিন্তু সেই দয়া কিভাবে আসে তা বুঝবার মতো অনুভূতি চাই। অনেক সময়ে আঘাতও আশীর্বাদ হয়ে ওঠে, বিপদ-আপদও হয়ে উঠতে পারে মোড়কে ঢাকা উত্তরণ। ঠাকুরকে ঠিকমতো বুঝতে হলে মনের একটু গভীরতাও দরকার। বুদ্ধি দিয়ে ঠাকুরকে বোঝা যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে বোঝা সহজ।

আমাদের নামধ্যান তপস্যা ইত্যাদির একটাই লক্ষ্য। ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা গজিয়ে তোলা। ভাব-আবেগের ভালবাসা নয়, দায়দায়িত্ব সম্পন্ন ভালাবাসা। আর ভালবাসা তাড়াতাড়ি আসে ঠাকুরের আদেশ নির্দেশ পালন, তাঁর সেবা, তাঁর চিন্তা নিয়ে থাকার ভিতর দিয়ে। আমি তো কাঁচা বয়সেই দীক্ষা নিয়েছিলাম, অনেক দিকে নানা আকর্ষণ ছিল, তবু ঠাকুরই আমার আকর্ষণে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে কেন দাঁড়ালেন তা তখন বুঝিনি। আজও যে বুঝি তা নয়। শুধু বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়, এটা কি করে ঘটল?

আগে হিমাইতপুর বা পাবনা বলতেই ঠাকুরের অনুষঙ্গ চলে আসত, তেমনি পরবর্তীকালে দেওঘর মানেই ঠাকুর এবং সৎসঙ্গ। এই শহরটি যে ঠাকুর নির্বাচন করেছিলেন তারও বোধহয় গূঢ় কারণ আছে। এত সুন্দর শহর বড় বেশি নেই। শহরের নির্মাণের কথা বলছিনা, বলছি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। দেওঘর সমতল নয়, মালভূমি। অনেক টিলা এবং উচ্চাবচ ভূমি নিয়ে এই শহরের বিস্তার। জলবায়ু অত্যন্ত ভাল। কিছুকাল আগে পর্যন্তও এই শহরে প্রার্থিত নির্জনতা ছিল। বৈদ্যনাথ মন্দির বা সৎসঙ্গের উৎসব ছাড়া খুব একটা জনসমাগম ছিলনা। কিন্তু দেওঘর জেলা হয়ে যাওয়ায় সদর দফতর হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব বেড়েছে, ভিড়ও বাড়ছে। তবু যাই-যাই করেও সৌন্দর্যের একটা রেশ এখনও আছে।

হিমাইতপুরে যেমন, এখানেও তেমনি ঠাকুর বড় একটা নিষ্কণ্টক জীবন কাটাননি। এখানে বহিরাগত বলে, ধর্মীয় পুরুষ বলে, দখলদার মনে করে ঠাকুরকে স্থানীয় মানুষদের অত্যাচার অনেক সহ্য করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে সব প্রতিকূলই অনুকূল হয়ে যায় ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমে। দেওঘরও ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু দেওঘর জায়গাটিকেই কেন ঠাকুর পছন্দ করেছিলেন সেটা আমি ভেবে দেখেছি। আমার মনে হয়েছে দেওঘর জায়গাটিরই একটি বিশেষত্ব আছে। কেমন যেন একটা অতিরিক্ত মাত্রা বা আরও একটা ডাইমেনশন। আমার মনে হওয়াটা অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত নয়। শুধু মনে হওয়াই। তবু দেওঘরকে আমার সাধারণ আর পাঁচটা মফসসল শহরের মতো মনে হয় না। একটু যেন আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ দেওঘরে পাই। ১৯৪৬ সাল থেকে দেহাবসান পর্যন্ত ঠাকুর দেওঘরে ছিলেন, মাঝখানে কিছুদিন নানা অশান্তির জন্য দুমকায় বসবাস করেন। তবে সেটা সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবেই।

দেওঘরে ঠাকুর আবার নতুন করে সব শুরু করলেন। কেন এত কষ্ট করলেন তার স্পষ্ট জবাব তিনি কোনওদিনই দেননি। একটা হতে পারে যে, পাবনা বা পূর্ববঙ্গ যে পাকিস্তান হয়ে যাবে তা সর্বজ্ঞ ঠাকুর অনেক আগেই জানতেন। তাই একবছর আগেই জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসেন। ঠাকুর গঙ্গার পশ্চিম কূল এবং তার চেয়েও বেশি বর্ধমানের প্রশংসা করেছেন। অনেককে বলেছেন বর্ধমানে বাড়ি করতে। কিছু কিছু জায়গাকে ঠাকুর একটু বেশি পছন্দ করতেন। যেমন বর্ধমান, যেমন দেওঘর। কিন্তু ঠাকুর বিশেষ ভ্রমণশীল

ছিলেননা। যেটুকু তথ্য পাই, তিনি একবার মায়ের সঙ্গে আগ্রা গিয়েছিলেন, বারকয়েক গেছেন পুরী, আর পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া এবং কাছাকাছি অঞ্চলে তাঁর যাতায়াত ছিল। কলকাতা থেকে গেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কয়েকটি জায়গায়। দুমকায় কিছুদিন ছিলেন। হ্যাঁ, একবার অসুখ হওয়ায় কার্শিয়াং-এ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন ছিলেন। আর কোথায় কোথায় গেছেন তা জানিনা। তবে গেলেও ঠাকুর যে খুব একটা ভ্রমণরসিক ছিলেন তা নয়।

ঠাকুরের একটা ছোট্ট বাণী হল "ধরে দাঁড়াও, ছেড়ে দাঁড়ালে পড়েও যেতে পারো।" এই বাণীটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বেশির ভাগ মানুষই আত্মগর্বী, মাথা নোয়ায়না, কারও অনুগত হয়না বা নিজেকে শ্রেয়র অধীনস্থ করতে চায়না। ওই যারা ছেড়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ যারা শ্রেয়র ইচ্ছাধীন হয়না, তাদের নিরালম্ব স্বাধীনচিত্ততার কিন্তু অভিমুখ থাকে না। তারা অনেক বিষয়ে সফল হলেও জীবনে নানা গোঁজামিল থাকে। কিন্তু গুরু-নির্ভর হলে, অনুশাসন মেনে চললে চিন্তায়, ভাবনায়, আচরণে একটা পরম্পরা তৈরি হয়, ভালমন্দের বোধ আসে, সিদ্ধান্ত নিতে সময়ক্ষেপ করতে হয়না।

ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার আগে আমার চিন্তায় যে সব জট ছিল তা দীক্ষা নেওয়ার পর অনেক সরল হয়ে গেছে। ঠাকুরের চিন্তাভাবনা নির্দেশগুলিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা যত করেছি তত হোঁচট কমেছে। ঠাকুরের পন্থায় কিন্তু করারও শেষ নেই, হওয়ারও শেষ নেই। ঠাকুর "আরোতর" কথাটা খুব পছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন, আমরা আরো, আরো অগ্রসর হতে থাকি, ভীমকর্মা হয়ে উঠি।

ঠাকুরকে আশ্রয় করলে সবই হয় বটে, তবে তার জন্য নিজেরও আয়াস-প্রয়াস লাগে। ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, সুতরাং আত্মশক্তিকে বৃদ্ধিপরায়ণ করতে হলে সেইরকম নামধ্যানের গতি বাড়াতে হয়, এবং সেই সবই করতে হয় যাতে ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা আরো নীরেট হয়ে ওঠে। আর যত ঠাকুরের প্রতি আসক্তি বাড়ে ততই আমাদের বোধবুদ্ধি এবং অনুভূতির রাজ্য প্রসারিত হতে থাকে। সেটা কিভাবে হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। কিন্তু করলেই যে হয় তা অভিজ্ঞতা থেকে জানি। অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতারও মান্যতা আছে। বিজ্ঞান দুনিয়ার সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনা, আপাততঃ সেটা সম্ভবও নয়।

ঠাকুরের সঙ্গে জড়ানো জীবন আর ঠাকুরকে ছাড়া যে জীবন তার মধ্যে অনেক তফাত। ঠাকুর যেহেতু অনুশাসন প্রবর্তনকারী পুরুষ সেইহেতু তাঁর পথে চলতে গেলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। আর এই নিয়ম বা শৃংখলা মানতে গেলেই অভ্যস্ত জীবনের পরিবর্তন ঘটে। অনেকে এই পরিবর্তন মেনে নিতে চায়না বা পারেনা। এই অপারগতা থাকলে দীক্ষা নিয়েও তেমন কিছু হয়না।

আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ধারণা হয়েছে, ঠাকুর যে পুরুষোত্তম তার কারণই হল তাঁর অনন্য অনুশাসনবাদ। আর কোথাও, কোনও আধ্যাত্মিক সংগঠনে তেমন ধরাবাঁধা কঠোর নিয়মকানুন নেই। ঠাকুর ব্যতিক্রম। তার কারণ ঠাকুর তো শৌখীন ধর্ম করতে আসেননি। ধর্মের সারাৎসার যে অস্তি-বৃদ্ধি আর তার প্রতিপালনই যে ধর্মাচরণ তা অনুধাবন করতে গেলে অনুশীলনের ভিতর দিয়েই করতে হয়। আর তা না করলে যেমনতেমন জীবনযাপন হয়, তার কোনও অভিমুখ থাকে না। ঠাকুরের কাছে গিয়েই প্রথম অনুভব করি জীবনের মাধুর্য, তার অমৃতত্ব উপভোগ করতে হলে তপশ্চর্যা প্রয়োজন। আর তপশ্চর্যা শুধু জপ-তপ নয়, দৈনন্দিন আচার-আচরণও যেন তাঁর মনোমত হয়।

যতদূর জানি আমাদের কুলদেবতা হলেন জগদ্ধাত্রী। আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীর বড় একটা ছবি ছিল ঠাকুরের আসনে। সেই সঙ্গে অবশ্য পেতলের গোপাল, লক্ষ্মীর পটও ছিল। আমাদের একটা কাপড়ের দোকান ছিল ময়মনসিংহের বাজারে, তার নাম ছিল জগদ্ধাত্রী ভাণ্ডার। আমাদের পরিবারের অনেকেই আবার ছিলেন রামঠাকুরের ভক্ত এবং শিষ্য। স্বয়ং রামঠাকুর আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িতে এসেছেন এবং অবস্থানও করেছেন। আমাদের ময়মনসিংহের বাড়ির পাশেই ছিল গোলোকপুর জমিদারের বাড়ি, যাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সখ্য ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাবা শিবচন্দ্র ওঁদের এস্টেটেই একসময়ে চাকরি

করতেন। সেই সুবাদেই কিনা জানিনা, মাতা মনমোহিনী মাঝে-মাঝেই গোলোকপুরের বাড়িতে আসতেন। আমার পিসিমাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আমার বাবাকে দেখেছি, খুব কালীভক্ত। আর মা সারদেশ্বরী আশ্রমে স্বয়ং গৌরীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় মানুষ। বলতে পারা যায়, আমার পরিবারে অনেক ভাবধারার একটা সম্মেলন ঘটেছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি কোন পন্থা নেবো, কার অনুশাসন গ্রহণ করব এটা ঠিক আমার ইচ্ছাধীন ছিলনা। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছেই ঘাট বাঁধা ছিল বলে আমাকে তাঁর কাছেই আসতে হয়েছে। ঠাকুরকে যত দেখেছি, বুঝবার চেষ্টা করেছি, আঁকড়ে ধরেছি ততই মনে হয়েছে সম্পর্কটা বোধহয় এক জন্মের নয়। আরও মনে হয়েছে, দীক্ষা নেওয়ার অনেক আগে থেকেই, হয়তোবা আমার জন্মের পর থেকেই তিনিই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ঠাকুরের মতো এমন আশ্চর্য মানুষ, এমন আশ্চর্য আবির্ভাব আমি তো আর দেখিনি। আর তাঁকে না দেখলে বোধহয় আমার ঘোর নাস্তিকতার অবসানও ঘটতনা। তাঁর কাছে গিয়ে যে আমার সব অনুসন্ধান শেষ হল, এমন নয়। বরং ঠাকুর আমার মধ্যে নূতনতর প্রশ্ন জাগিয়ে দিলেন।

নূতনতর এক প্রক্রিয়ায় জীবনকে বদলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে খাত বদলের সমস্যাও এল অনেক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শুরু হল নানা দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক। এসব হওয়া অনিবার্যই ছিল। ঠাকুরের প্রদর্শিত পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যেও। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল ঠাকুর সোজা সরল পথেই চলেন, ঘুরপথের পথিক নন। যা ভাল তা আপাতবিচারে যতই অনভিপ্রেত বলে মনে হোক সেটাকেই তিনি গ্রহণ করেন। লোকের কথায় টলেন না।

লোকের ধারণা ধর্ম মানে কিছু সদুপদেশ। তার বেশি কিছুই নয়। এবং ধর্মের সঙ্গে বুজরুকির ব্যাপারটার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এ ধারণা মিথ্যেও তো নয়। ধর্মের নামে কতই প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ঘটে, বুজরুক বা ম্যাজিকওয়ালাদেরও অভাব নেই। ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রথম বুঝলাম, কঠোর এবং অনমনীয় অনুশাসনবাদ ছাড়া ধর্মাচরণ হয়না। আর ধর্মাচরণ মানেই যেহেতু জীবনযাপন, ঘর-গেরস্থালী, চাকরিবাকরি, প্রেম প্রণয়, সন্তান পালন, কৃষিকাজ, শিক্ষা, লোকব্যবহার সর্বত্রই ধর্মাচরণ করতে হয়। প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ঠাকুরকে মেলানো যাবেনা।

এ যুগে মানুষের বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি খুবই দুর্বল। তার কারণ নানা মতবাদে জর্জরিত মস্তিষ্কে মানুষের মন এখন সততই সন্দেহাকূল। ফলে কোনও কিছুকে সহজ সরল ভাবে বিশ্বাস করতে বা নির্ভর করতে পারেনা। কিন্তু বিশ্বাস না থাকলে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। আর এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য ঠাকুর যে পন্থা নির্দেশ করেছেন তা হল নাম-ধ্যান, জপ। সঙ্গে সদাচার এবং নিষ্ঠা। বিশ্বাস ঠেলে উঠবে।

আপাতদৃষ্টিতে ঠাকুরের ভরভরাট সংসার ছিল। সেই সংসারের কর্তা হিসেবে নিজের যথাকর্তব্য ঠাকুর পালনও করতেন। তবু খুব প্রকটভাবেই বোঝা যেত যে তিনি সংসারে সংসক্ত নন। বরং তাঁর ব্যক্তিগত সংসারের সীমানাকে তিনি জগৎ সংসারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। আমান ঈশ্বর-পুরুষ, পূর্ণাবতার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংসারজ্ঞান তবু এত টনটনে কি করে ছিল সেইটেই বিস্ময়ের। আর তিনি এবার যেন এসেছেন সংসারী মানুষদের জন্যই। কতিপয় সন্ন্যাসী-যতি তৈরি করেছিলেন ঠিকই, তবে সংখ্যায় বেশি নয়। যতি-সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বা কৌপীনও ধরাননি, কিন্তু জীবন-যাপনে কঠোর অনুশাসন আরোপ করেছিলেন। যতিরা সাজা-সন্ন্যাসী নন, সত্যিকারের সন্ন্যাসী। ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়, পরিবারের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জন করতে হয় ইত্যাদি। অনেকেই এই কঠোর ব্রত ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু যাঁরা ধরে রাখতে পারগ হয়েছেন তাঁদের উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। ঠাকুর নিজে যতি আশ্রমে প্রতিদিনই বেশ কিছুটা সময় কাটাতেন, যতিদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'যতি অভিধর্ম' গ্রন্থটিকে কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। তার ভাষা ও বাক্য এতই অসাধারণ যে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সেখানে তিনি নির্দেশ করেছেন, যতিদের মাথার ওপর ছাদ হবে মহাকাশ, শয্যা হবে ভূমি ইত্যাদি। রিক্ত জীবনের ঐশ্বর্য কোথায়

রয়েছে যতি যেন তারই অভিযাত্রী। প্রকৃত সন্ন্যাসী কাকে বলে যতিদের জীবনযাপন দেখলেই তা বোঝা যায়। কোনও ভেক নেই, গেরুয়া নেই, কিন্তু সৎ-এ ন্যস্ত হওয়ার শর্তগুলির মান্যতা আছে। ঠাকুর ধর্মকে যতটা জীবনীয় ও ফলিত করে তুলেছেন তা তাঁর এইসব উদ্যোগের ভিতর দিয়ে বোঝা যায়।

তেমনি হল স্বস্ত্যয়নী। ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী প্রসঙ্গে কত আলোচনা করেছেন তার হিসেব নেই। স্বস্ত্যয়নীকে তিনি এক উচ্চতম মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। জীবনের জটিল, গভীর সমস্যা, মানসিক বিকার থেকে গ্রহদোষ বা ভাগ্য বিপর্যয় সবই জয় করা সম্ভব নিষ্ঠাভরে স্বস্ত্যয়নী নিবেদন করলে। এবং স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ ঠাকুর নির্দেশিত লোককল্যাণকর সেবায় নিয়োজিত হলে, এই উদ্বৃত্ত অর্থ কোনও ক্রমেই, কারও নির্দেশেই কোনও সংঘেই দেওয়া যায় না। এই অর্থ নিজের নামে সঞ্চিত রেখে, ক্রমবর্ধমান লগ্নীর মাধ্যমে বাড়িয়ে তা থেকে লোকসেবা নিজের হাতেই করা বিধি। এর ব্যত্যয় যারা করে তারা স্বস্ত্যয়নীর অন্তর্নিহিত মঙ্গলের অধিকারী হতে পারেনা। তবে যাদের সন্তান নেই বা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব বা নিঃসঙ্গ ব্যক্তি শেষ বয়সে সঞ্চিত স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত লোক কল্যাণকর কাজে ব্যয় করার জন্য বিশিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা ইষ্টভ্রাতার তত্ত্বাবধানে তা সংঘের তহবিলে দিতেও পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্ত্যয়নী প্রবর্তন করেছেন মানুষের পরার্থপরতা ও সেবাবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য এবং তার নীতি বিধি তিনিই স্থির করে দিয়েছেন। স্বস্ত্যয়নীর পঞ্চনীতির মধ্যেই এই অর্ঘ্য কিভাবে ব্যয় করতে হবে তা বিস্তারিত বলা আছে। বিকল্প কোনও পন্থা নির্দেশ করেননি। সুতরাং ঠাকুরের নির্দেশিত পন্থা থেকে বিচ্যুত হলে তা আর তাঁকে নন্দিত করে না, ইষ্টেতর স্বার্থে নিয়োজিত হয়ে ব্রতভঙ্গ ঘটে। আর স্বস্ত্যয়নী কাঁটায় কাঁটায় পালন করলে কী হয় তা আমার নিজের জীবনেই একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্বস্ত্যয়নী সম্পর্কে ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত অনেক বাণী আছে। স্বস্ত্যয়নীর চরণামৃত যে গ্রহদোষ খণ্ডন করে সে বিষয়ে ঠাকুর যা বলেছেন তা এক জ্বলন্ত সত্য। সুতরাং এই মহান ব্রতটির গুরুত্ব বুঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অনুসরণ করাই বিচক্ষণতার কাজ।

স্বস্ত্যয়নী নিয়ে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গবেষণা হবে। আমার তো বহুবার মনে হয়েছে ব্রতবিধির পাঁচটি নীতির মধ্যে এক গভীর জীবনবোধ নিহিত রয়েছে। ব্যাখ্যা করলে ওই পাঁচটি নীতি নিয়ে গবেষণামূলক বই লেখা যায়। ঠাকুর নিজে স্বস্ত্যয়নী নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। বিশেষ করে ভূ-সম্পত্তি স্বস্ত্যয়নীর অধীনে আসতে শুরু করলে একদিন স্বস্ত্যয়নীর এক বিশাল কৃষি বিপ্লবও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। ভাগবৎ অর্থনীতির প্রকৃত রূপ আমরা তখনই প্রত্যক্ষ করব। শুধু কৃষিজমি নয়, যে-লগ্নীতে ক্ষতির আশঙ্কা নেই বা ফাটকার ভয় নেই সেরকম নিরাপদ প্রকল্পে স্বস্ত্যয়নীর অর্থ নিয়োগ করা যায়। আর এটা করতে হবে স্বস্ত্যয়নী ব্রতধারীকেই। আর এই ভাগবৎ-মঙ্গলমুখী কাজের ভিতর দিয়েই ব্রতধারীর জীবন প্রসার লাভ করতে থাকে। ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত প্রবর্তন করে আমাদের সামনে অশেষ মঙ্গলের দরজা খুলে দিয়েছেন।

ঠাকুরের বাণীগুলিকে সরাসরি গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। কারও কোনও ব্যাখ্যা বা বিকল্প ব্যবস্থা অথবা বাণী ও নির্দেশের অন্যথা করা ইষ্টবিরুদ্ধ। আর এই জন্যই নিজের বাণীগুলি সম্পর্কে ঠাকুর অতিশয় সাবধানী ছিলেন। এগুলির যাতে কোনওরকম বিকৃতি বা পরিবর্তন করা না হয় বা টীকা ভাষ্য দিয়ে মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করা না যায়, তাই ওই সতর্কতা। কাজেই ভক্তদের সরাসরি ঠাকুরের বাণীগুলি থেকেই জীবনীর রসদ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের বিকল্প বা স্থলাভিষিক্ত কেউ নেই বা ছিলও না কখনও। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁরই ধ্যান, তাঁরই অনুশাসন অনুসরণ করা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

মুশকিল হল স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে চাষের জমি কেনা নিয়ে। যাঁরা গ্রামে থাকেন তাঁরা পারেন। যারা শহরে থাকেন তাঁদের পক্ষে জমি কিনে চাষ করানো কঠিন। প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া ওতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। ঠাকুর তাই নিরাপদ লগ্নীর কথাও বলেছেন। ডাকঘর বা সরকারি ঋণপত্র মারফৎ লগ্নীতে বাধা নেই। মোটকথা স্বস্ত্যয়নীর সম্পদকে রক্ষা ও ক্রমবর্ধমান রেখে লোককল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা। সেটা না হলে স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অনেকে ভাবেন স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ করলে তবেই মাছ-মাংস ছাড়তে হয়। ঠাকুরের নীতি বিধির খোঁজখবর যাঁরা বিন্দুমাত্র রাখেন তাঁরাই জানেন, এরকম কথা ঠাকুরের কোথাও বলা নেই। মাছ-মাংস দীক্ষা গ্রহণ করলেই ছাড়তে হয়। যেহেতু আমিষ ভোজ্য ও পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদির কিছু ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া আছে সেইহেতু তা ছাড়াই উচিত। যাঁরা দীক্ষা নেননি তাঁরাও অনেকেই মাছমাংস বর্জন করেছেন স্বাস্থ্যের কারণেই। মাছ-মাংসের কিছু উপকারও আছে, যেমন পেঁয়াজ রসুনেরও আছে। কিন্তু উপকারের সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও শরীরে বাসা বাঁধে এবং তা ক্রমে নানা রোগের দরজা খুলে দিতে পারে। সুতরাং স্বস্ত্যয়নীর সঙ্গে নিরামিষকে যুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্বস্ত্যয়নীর আগেই আমিষ পরিত্যাগ করা ভাল। সু অস্তি অয়ন অর্থাৎ অস্তিবাচক জীবনীয় অভ্যাসকে এস্তামাল করার ব্রতই হল স্বস্ত্যয়নী। নিষ্ঠার সঙ্গে সদাচার রক্ষা করে চলা, লোকব্যবহারকে বিনায়িত করা এবং নিজের সামাজিক অবস্থানকে প্রসারিত করে বিস্তার লাভ করা এই ব্রত ধারণের অন্যতম শর্ত। তবে এ বিষয়ে আমার চেয়ে বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেক ভাল আলোচনা করতে পারবেন।

ঠাকুর প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য তিল ও বাদাম বাটা খাওয়ার কথা বলেছেন। তবে নাম-ধ্যান, ইষ্টকর্ম, সদাচার পালন এবং মনকে অমলিন রাখায় যারা ব্যাপৃত তাদের শরীর বিধানও বিকারের অধীন হয় কমই। ঠাকুরের একটা ছোট্ট কথা আছে, নাম করলে আর কিছু না হোক শরীরটা ভাল হয়। তাঁর এই তুকটি কিন্তু আমি নিজের জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

মনোজগৎই আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। চিরচঞ্চল ও অবশীভূত মনকে নিয়েই আমাদের যতেক সমস্যা। ঠাকুর এই মনের কথাই বারবার বলতেন। বলতেন, নাম মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, ধ্যান মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে। জপ ও ধ্যান তাই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের মনকে কেন্দ্রায়িত করে তোলে। ঠাকুর concentric কথাটাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। concentric বা কেন্দ্রায়িত হতে পারলে মানুষের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই হতে পারে। মন্ত্র শব্দের অর্থ যা মনকে ত্রাণ করে। আর এ যুগটাই মানসিক বৈক্লব্যের যুগ। কলকব্জা, প্রযুক্তি যত বাড়বে ততই মানুষের মনের জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের চেতন মনের চেয়ে অবচেতন মন বহু বহু গুণ বড়। আর সেই অবচেতনের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু ঠাকুর যেভাবে ধ্যান ও নামের প্রক্রিয়া আমাদের শিখিয়েছেন তা অনুশীলন করলে চেতন মনের ব্যাপ্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। অবচেতনকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এ ব্যাপারে ঠাকুরের নির্দেশিত শব ধ্যানও এক অমৃততুল্য প্রক্রিয়া। নিয়মিত দিনে পাঁচ-ছয়বার শবধ্যান করলে মস্তিষ্কের একেবারে কেন্দ্রে নামের ধুন বা তরঙ্গ গিয়ে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে তা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। শরীর ও মনের ওপর তার প্রভাব অমৃততুল্য। ঠাকুর বলতেন, শবধ্যান করলে হঠাৎ হার্ট ফেল হয়না।

ঠাকুরের দেওয়া বিধানগুলি এ যুগের মানুষের কাছে প্রাথমিক বিচারে গ্রহণযোগ্য মনে না হতেই পারে। কিন্তু গভীর এষণা নিয়ে এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় ত্রাণ পাওয়ার আকূলতায় ঠাকুরের অনুশাসনকে বিচার করলে দেখা যাবে, এই অস্তিমুখী জীবন-বিজ্ঞানই ধর্মের মূল কথা। ঈশ্বরপ্রাপ্তি তখনই ঘটে যখন মানুষ সর্বাংশে তার নিজ সত্তাকে জানতে পারে।

বেশ কিছুদিন পর ঠাকুর সম্পর্কে লিখতে বসেছি। আমার অলস এবং গেঁতো স্বভাবের দরুন এতদিন কিছুই লেখা হয়নি। আর এই কর্মে কুণ্ঠাই আমার মস্ত দোষ। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শুধু আমার জীবন-দেবতাই নন, তিনি আমার নিত্যকার রক্ষাকর্তা, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর দয়ায় নিষিক্ত। তিনি না হলে আজ যে আমি কোথায় থাকতাম তার অনুমানও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এত বড় বন্ধু আর কেউ নয়। ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে দেহ রেখেছেন, কিন্তু আজও তাঁর মতো জীয়ন্ত এবং সর্বদা সমুপস্থিত সত্তা আর হয়না। তিনি সর্বদাই আমাকে রক্ষা করছেন, এ আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি। কিন্তু তাঁর জন্য আমার যা করা উচিত ছিল তা আর আমার করা হয়ে ওঠেনা।

ঠাকুর এই দুর্মর আলস্যের খুব বিরোধী ছিলেন। মানুষের কর্মক্ষমতা যে কতটা, কতটাই যে অঘটনঘটনপটিয়ান এবং অসাধ্য সাধক তা তাঁর ভক্তদের কঠিন কর্মে নিয়োগ করে বার বার দেখিয়েছেন। ইষ্টে টান থাকলে, ভালবাসার জোর থাকলে, যোগযুক্ত থাকলে মানুষ না পারে এমন কাজ নেই। ঠাকুর ভাবের মানুষ ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দিতেননা, হাতেকলমে তাঁর সব তত্ত্বকেই ফলিত করে তুলতে চাইতেন।

আমার দুর্ভাগ্য যে, ঠাকুরকে খুব কাছে পাইনি। তাঁর নিকটে যাওয়ার বিধিনিষেধ ছিল। আমি যখন দীক্ষা নিই তখনই তাঁর বয়স সাতাত্তরের কাছাকাছি। শরীরও ভাল ছিলনা। ঠাকুর যে স্তরের মানুষ সেই স্তরের অস্তিত্বই আলাদা রকমের। অতি-অনুভূতিশীল বলেই ঠাকুরের কাছে আসা লোকজনের তরঙ্গাভিঘাত তাঁর ওপর গিয়ে পড়ত। আমাদের অনুভূতি অনেক স্থূল বলে আমরা ওসব তেমন টের পাইনা। কিন্তু পরম পুরুষের কথা আলাদা। যাই হোক, নানা কারণেই অধিক মানুষকে তাঁর খুব কাছে যেতে দেওয়া হতনা। নিষিদ্ধদের দলে আমিও ছিলাম। তার জন্য অবশ্য কোনও দুঃখ নেই। কাছে না গেলেও তাঁকে তো মনেপ্রাণে নিকটেই পেয়েছি। তাই সাহচর্যের অভাব তো হয়নি!

ঠাকুরের কাছাকাছি বাস করলেই যে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক অগ্রগমন ঘটবে বা সব সমস্যার সমাধান হবে, এটা মোটেই নয়। আসলে তাঁর শারীরিক নৈকট্যে বা সান্নিধ্যে থাকাটা বড় কথা নয়। ঠাকুরের সঙ্গ করতে গেলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাম-ধ্যান, প্রেম ও আনুগত্য। যাঁরা ঠাকুরের কাছে ছিলেন তাঁরা সকলেই যে উদ্বর্দ্ধিত হয়েছেন এমন নয়। কারণ কাছে থাকলেই হয় না, তাঁর সঙ্গে সৎনামের যোগসূত্রটিরও দরকার হয়। আর প্রয়োজন প্রতিদিন আত্মসংশোধন ও আত্মশুদ্ধি। বাসি জামাকাপড় কেচে নেওয়ার মতো বা স্নান বা প্রক্ষালনের মতো।

রোজ নিয়মিত কিছুক্ষণ ধ্যান করা যে কতটা জরুরী তা আমি ভালই জানি। আর মনে রাখা ভাল, যতক্ষণ ধ্যান ততক্ষণই ঠাকুরের সঙ্গ করা।

গিধনীতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গের আশ্রমে একটি অত্যন্ত ভাল প্রথা প্রচলিত আছে। প্রতি উৎসবেই সেখানে ধ্যানগৃহে বাহাত্তর ঘণ্টা অবিরাম সমবেত নাম-ধ্যান হয়। এই সমবেত নাম-ধ্যানে গুরুভাইরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। ঠাকুর নাম-ধ্যানের যে রীতি ও নিয়ম নিরূপণ করে দিয়েছেন ঠিক সেই রীতিতেই নাম-ধ্যান করা উচিত।

নীলদাঁড়া সোজা রেখে সুখাসনে বসা, মাথা মুখ পাতলা চাদরে ঢেকে নিয়ে তদগত চিত্তে ঠাকুরের অবয়ব, তাঁর বাণী, তাঁর দর্শনকে নিবিষ্টতায় নিয়ে আসা, সর্বোপরি তাঁর প্রতি একটা ভালবাসার ভাবকে সর্বদা উদবেজিত করাই আসল কথা। ঠাকুর যে বলেছেন "সূক্ষ্ম-সার্থক বিভেদ-বিচার, সফল অনুভব, ক্ষিপ্র চিন্তা, স্মৃতি, কর্ম ধ্যানেরই বিভব" এর মতো সত্য কথা আর নেই। আমি নিজে খুব ধ্যানী মানুষ নই। সংকটে পড়লেই ধ্যানে বসি মাত্র। কিন্তু দেখেছি, ধ্যান নিতান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে করলেও তার বিপুল ফল পাওয়া যায়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে, কাজে কর্মে গতি ও লক্ষ্য আসে। ঠাকুর বলেছেন, সব কাজের মধ্যে যদি নামের চাকা ঘুরতে থাকে, তাহলে চিন্তাশক্তির লাঘব একটু হয় বটে, কিন্তু কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ডংকা মেরে সংসার করবি আর ব্রহ্ম সিংহাসনে বসে থাকবি। পুণ্য পুঁথিতে ঠাকুরের এই কথাটি আমার বড় ভাল লাগে। সংসারের সঙ্গে ব্রহ্ম মিশ খায় কিনা জানিনা, কিন্তু সংসারবুদ্ধি প্রবল হলে ব্রহ্মসাধনা হয়ে ওঠেনা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ঠাকুরের যে জীবনযাপন ছিল তার রসায়ন একদম অন্যরকম। সংসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, অথচ আরূঢ় রয়েছেন ভাবরাজ্যে, জ্ঞানের চূড়ান্ত শীর্ষদেশে, ভক্তিমার্গে, প্রেমের রূপময়তায়। কোথায় তাঁর সংসারের শেষ, কোথায় তাঁর আধ্যাত্মিকতার শুরু সেই বিভাজন রেখাটি আজও আবিষ্কার করা যায়নি। ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য জীবনযাপনটি আমার কাছে বরাবর রহস্যময় লেগেছে। ঠাকুরের অনুশাসনের নানা দিক আছে, দিগন্তও আছে। সব কিছু অধিগত করা গড়পড়তা মানুষের ধী শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুরের আমরা ততটুকুই নিতে পারি যতটুকু আমাদের বৈশিষ্ট্যের পক্ষে অনুকূল। বৈশিষ্ট্যপালী

আপূরয়মান পুরুষ হলেন ঠাকুর। দুনিয়ার মানুষের যত রকম বৈশিষ্ট্য আছে তার সব কটিকেই তিনিই একমাত্র পূরণ করতে পারেন। পাপী, তাপী, বিকারগ্রস্ত, পাগল বা শয়তান কেউই তাঁর ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের বাইরে নয়। পরমপ্রেমময়ের প্রেম আর ক্ষমা ছাড়া কীই বা আছে! আরও একটা জরুরী কথা হল, মানুষকে আমরা যে দৃষ্টিকোণ বা মনোভাব থেকে দেখি বা বিচার করি তাতে নানা ভুল থাকে। আমরা দেখি বা বিচার করি আমাদের পূর্ব সংস্কার থেকে বা অভিভূতি থেকে। মাতাল, বেশ্যাসক্ত, পাগল, রগচটা, ধান্দাবাজ মানুষকে আমরা এড়িয়ে চলি এবং হয়তো পছন্দও করিনা। কিন্তু ঠাকুরের দেখা বা বিচার আমাদের মতো নয়। যে কূলপ্লাবী প্রেমে তিনি নিষিক্ত সেই প্রেমের চোখেই তিনি সব মানুষকে দেখেন। যে-মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ঠাকুর তার ওপরেও বিশ্বাস হারান না। তাই বিধ্বস্ত মানুষের কাছে তিনি পরম আশ্রয়।

"যে কার্য্যে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসছে, নিশ্চয়ই জেনো তা পণ্ড হওয়ার মুখে।" এবং "উত্তেজিত মস্তিষ্ক ও বৃথা আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা—দুইটিই অসিদ্ধির লক্ষণ।" শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিরচিত সত্যানুসরণের এই দুটি বাণী যে কতবার আমাকে অকৃতকার্যতা থেকে রক্ষা করেছে তার হিসেব নেই। দুটি অমোঘ কথা, গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের উন্মোচন। মানুষ যে কোনও কর্মেই নিয়োজিত থাকুক না কেন সেই কাজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হয়। ক্রোধ ও বিরক্তি এলে কাজ এলোমেলো, লক্ষ্যহীন, অসফল হয়ে যাবে। আবার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হলে আবিল হবে একাগ্রতা। আবার যে কাজ করছি তার সম্পর্কে অযথা অহঙ্কারপ্রসূত সাফল্য ও কৃতিত্বের বৃথা চিন্তা করলে নিষ্ঠার বারোটা বাজবে। কর্মীকে তাই ঠাকুর এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, কর্মের মধ্যেও আমাদের ভূমিকা হবে ব্রতধারীর মতো। ক্রোধ, বিরক্তি, অহংকার, মস্তিষ্কের বিকার এ সবই কর্মের পরম শত্রু। আমার মনে হয়, কাজের মধ্যেও নামের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস থাকলে কাজের ব্যাঘাত হয়না। ঠাকুর এরকমই তো বলেছেন, সব কাজের ভিতর ঘুরুক দেখি নামের চাকা, চিন্তাশক্তির লাঘব হলেও কাজের ব্যাঘাত হবেনা।

ঠাকুরের সত্যানুসরণের এই দুটি কথা নিয়ে আলোচনা করার একটা কারণ আছে। আমি আমার জীবনে এই দুটি বাণীর প্রয়োগ ও অব্যর্থতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আমার প্রধানতম পেশা হচ্ছে লেখা। অনেকেই হয়তো জানেননা, সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম শুধু মস্তিষ্কের চালনাই নয়, অনেকটা শারীরিক পরিশ্রমও বটে। এবং লেখা মানেই নিজের টেবিল চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দি ও আবদ্ধ হয়ে থাকা। মাথার খাটুনি মানুষকে কতটা অবসন্ন করে তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অনেক সময়েই সময়ের অভাবে এবং প্রবল কাজের চাপে মাথা বিভ্রান্ত হয়ে যায়, চিন্তায় মন্দা আসে। তখন সহায় হয়ে দাঁড়ান ঠাকুর। এই সংকটাপন্ন অবস্থায় ঠাকুরের বাণী অন্ধের মতো অনুসরণ করে দেখেছি, সামনে আলোকিত পথ উন্মোচিত হয়ে যায়। আর এ একেবারে অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুরের সৎনাম এবং তাঁর অনুধ্যান মানুষকে যে কোনও প্রতিকূল অবস্থা থেকেই মুক্তির পন্থায় নিয়ে যায়। অবশ্য দেখতে হবে, এই সংকটমোচন ইষ্টানুকূল কিনা। কেউ যদি নিজের প্রবৃত্তি তাড়িত মতলব হাসিল করতে চায় তাহলে অন্য কথা।

এই যুগে প্রবল হল মানুষের মনোসংকট বা মানসিক অবসাদ। সঙ্গে অভিভূতি এবং চাপা উদ্বেগ। যুগধর্মের এইসব লক্ষণকে এড়িয়ে থাকাই মুশকিল। তাই মনের হাত থেকে ত্রাণ করতেই ঠাকুরের সৎমন্ত্র। ঠাকুর স্বয়ং এই অবসাদের নিদানই আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের অনুশাসন যতটুকু জেনেছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে, আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের এই লড়াই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর। বিকারগ্রস্ত মন মানুষের ক্ষমতা, প্রতিভা, সম্ভাবনা সব নষ্ট করে দিতে পারে। মনের সঙ্গে যুদ্ধেই আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত হই। আর তাই ঠাকুরের নিদান, সৎমন্ত্র গ্রহণ এবং সদাচার পরায়ণ হয়ে আত্মসমীক্ষায়, আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া। ঠাকুর ভারী সুন্দর বলেছেন, "All my ritwiks are psycho fighters।"

ঠাকুর ঋত্বিকদের মানুষের মনোজগতের যোদ্ধা বলেছেন। অর্থাৎ ঋত্বিকরাই মানুষকে শেখাবেন কি করে নিজের অবাধ্য মনকে কব্জায় আনা যায় এবং নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এর জন্য সাধকদের কঠোর তপশ্চর্যা, ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তাদি করা প্রয়োজন। কারণ নিজের মনকে বশীভূত না করতে পারলে অন্যকে শেখানো যাবেনা। ঋত্বিকদের জীবনযাপনও তাই একটু আলাদা রকমের। আর পাঁচজনের মতো স্রোতে-ভেসে-যাওয়া জীবন নয়। আর ঠাকুরের নির্দেশিত পথ অবলম্বন না করলে জীবনের প্রকৃত আস্বাদও পাওয়া যায়না। মানুষ ভোগ করতে চায় বটে, কিন্তু প্রকৃত ভোগ কাকে বলে তারই সুস্পষ্ট ধারণা তার নেই।

ঠাকুর বলতেন ভারতীয় হিন্দু আর্য জীবনদর্শন আসলে ভোগবাদী। ভোগকে নিরঙ্কুশ করার জন্য ভোগের অন্তরায় যা তা ত্যাগ করাই এই দর্শনের মূল কথা। তাই ওই ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ বলা হয়।

আগ্রা সৎসঙ্গের সরকার সাহেবের নির্দেশে জননী কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন ঠাকুর। কিন্তু আগ্রা সৎসঙ্গের সব কৃত্যকে ঠাকুর অনুসরণ করেননি। ঠাকুর যে ধারার প্রবর্তন করলেন তার অনুশাসন ও বিধি কিছুটা ভিন্ন। ঠাকুর বরং আর্য-হিন্দু ধর্মের মূল ভাবধারার ওপরেই তাঁর অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেটা সবচেয়ে অভিনব তা হল এই অনুশাসনকে জীবন ও বাস্তবমুখী করে তোলা। ধর্মের মূল কথাই হল অস্তি এবং বৃদ্ধি বা বিকাশ। সুতরাং ধর্মের ওই জীবনমুখী, বিকাশমুখী অন্তঃশক্তিকেই সম্বর্ধনায় তুলে ধরলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চেনালেন ধর্ম প্রকৃত অর্থে কী এবং তার ফলিত রূপই বা কেমন। তবে কি ঠাকুর আগ্রা সৎসঙ্গকে বর্জন বা অস্বীকার করেছিলেন? তাও নয় কিন্তু। শেষ জীবন পর্যন্ত দেখেছি সরকারসাহেব, হুজুর মহারাজের ছবিসহ নিজের পিতামাতার ছবিকেও কত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করতেন। আগ্রার দুটি ভজনকেও বিনতী প্রার্থনায় স্থান দিয়েছেন ঠাকুর। কিন্তু আর্য-হিন্দু ধর্মের মৌলিক আধারের ওপর তাঁর অনুশাসনকে দাঁড় করাতে গিয়ে ঠাকুর কিছু অত্যাবশ্যক গ্রহণ বর্জন করেছিলেন। তাতে ভালই হয়েছে। আগ্রা সৎসঙ্গে আমি গেছি। একটি নির্মিয়মাণ মন্দির দেখতে গিয়ে শুনলাম সেটি তৈরি করতে একশো পঁচিশ বছর লাগবে। কিন্তু নির্মাণশৈলী দেখে এতদিন কেন লাগবে তা বোধগম্য হল না। জিগ্যেস করে জানলাম, একশো পঁচিশ বছর সময় ধরে নির্মাণ করতে হবে বলেই নাকি আদেশ আছে। তাই মন্দির তৈরি হচ্ছে খুব ধীর গতিতে। আমি যখন গিয়েছি তখনও মন্দির নির্মাণ শেষ হতে আরও বোধহয় ত্রিশ-চল্লিশ বছর বাকি। মন্দিরের শ্রীছাঁদ কিন্তু আহামরি নয়, এবং বড় কথা হল মন্দিরের নির্মিত অংশ পুরোনো হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নির্মাণের সঙ্গে খাপ খাচ্ছেনা। এই খামখেয়ালীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলনা। তারও পরে দেখি একটি সমাধিবেদীকে পরিক্রমা করতে করতে এক বাঙালি ভক্ত আমাদের দেখেই বোধহয় তেড়ে, অন্য সব আশ্রমের উদ্দেশ্যে গালমন্দ করছিলেন। মানুষটির আচরণে দুঃখ পেলাম। না, মাত্র এটুকু দেখে আগ্রা সৎসঙ্গ সম্পর্কে আমি কোনও ধারণায় উপনীত হইনি। ইচ্ছে ছিল, সেখানকার কোনও সাধু মহারাজের সঙ্গ করব। কিন্তু সুযোগ সময় কোনওটাই হলনা। তবে এটা জানি, এই পরম্পরায় মস্ত সব সাধকরা এসেছেন। হুজুর মহারাজ তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম। মাতা মনমোহিনীর গুরু ছিলেন তিনি। ঠাকুরের আবির্ভাবও তাঁর অবিদিত ছিলনা।

আগ্রা সৎসঙ্গও বিভাজিত হয়ে গেছে এবং একই বীজনামে বিভিন্ন গুরু পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে। দয়ালবাগ, স্বামীবাগ, বিয়াস ইত্যাদি। ভাঙন একবার শুরু হলে তা আরও ভাঙতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎসঙ্গের ভাঙনও ঠেকানো যায়নি। এতে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি সীমিত হয়েছে। ফলে ঠাকুরের ঈপ্সিত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজও বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হয়েছে। ঠাকুর এমন একজন মানুষ, এমনই অলৌকিক আবির্ভাব যে তাঁকে বোধের ভিতরে গ্রহণ করতেই হিমসিম খেতে হয়। ঠাকুরকে ঠিকমতো বুঝবার জন্য যে পাঠ, অনুধ্যান, ভালবাসা দরকার তা তো দুর্লভ। ফলে হয় কি, ঠাকুরকে আমরা আমাদের মতো করে ভেবে নিই। আর ওইখান থেকেই ভুল বোঝাবুঝির শুরু।

ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করাই হয়তো ভাল যে, আমি কর্তা হতে চাইনা, নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে চাইনা, আমার বুঝসমঝ তুমিই ঠিক করে দাও। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরেই তো আমি বুঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠাকুরের গভীরতা আর বৈচিত্র্য এত বেশি যে সাপটে ওঠা কঠিন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণ

বুঝে ওঠা বা উপলব্ধি করা আমাদের মতো গড়পড়তা মস্তিষ্কে সম্ভব নয়। আর ওই বিপুল ও বিচিত্র জ্ঞান বা ধী-শক্তিই বা কজনের আছে! কাজেই আমরা আমাদের সাধ্যমতো এবং আধারে যতটুকু আঁটে ততটুকুই তাঁকে ধারণ করতে পারি। দুঃখের কথা হল, বাংলা ভাষা নিয়ে আজীবন চর্চা করেও আমি ঠাকুরের বাণীগ্রন্থগুলি পড়তে গিয়ে অনেক জায়গাতেই বুঝতে অসুবিধেয় পড়ে যাই। শব্দার্থ, বাক্যগঠন ইত্যাদিও ঠাকুরের বড় কঠিন। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে বাক্যের নিহিত অর্থও অধিগত করা কঠিন হয়ে পড়ে, যেহেতু ঠাকুরের ভাবভূমি আমাদের নাগালের বাইরে।

তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মস্তিষ্ক দিয়ে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করিনা। কিন্তু ভালবাসার পথে চেষ্টা করলে তাঁকে আস্বাদ করা সহজ হয়। ওই ভালবাসাই আবার অনেক কঠিনকে তরল করে দেয়। বিপদে পড়লে তাই আমি ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিই। নিজের বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনা-বিচারবোধের ওপর নির্ভর করিনা তখন।

ঠাকুর আমাকে বহুবার বহুভাবে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এইসব ঘটনার বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা বা যুক্তিশৃংখল খুঁজে বের করতে পারিনি। ঠাকুর নিজে অলৌকিককে গুরুত্বই দিতেন না। যা বলতেন তার অস্যার্থ হল অনেকটা এরকম, তুমি কার্যকারণ বুঝতে পারোনি বলেই ওটা তোমার কাছে Miracle। এই মতকে আমি শতকরা একশো ভাগ বিশ্বাস করি। বস্তুত বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং যুক্তিবাদ দিয়ে বিশ্ব রহস্যের কূলকিনারা করা অতি কঠিন। এই বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, কে সৃষ্টি করল, কেন সৃষ্ট হল এইসব প্রশ্নের কোনও যুক্তি পরম্পরাগত ব্যাখ্যা নেই। এমনকি জড়বিজ্ঞান দিয়ে এই বিশাল, অনন্ত অসীম বিশ্বকে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের বোধের অগম্য কিছু কার্যকারণ, যা আমাদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, তা আমাদের জানার বাইরেই থেকে যায়। ঠাকুরের কৃপা তাই আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তা ব্যাখ্যা করতে পারিনা। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় নাম-ধ্যান করলে, সদাচারপরায়ণ হলে, নিষ্ঠা নিয়ে চললে একটু একটু করে বোধের দরজা খুলতে থাকে। ঠাকুর বলেছেন, জলদিবাজি চলবে না, ধীর হয়ে লাগোয়া থাকতে হয়।

ঠাকুরের পার্লারে মাঝেমধ্যে গিয়ে বসে থেকেছি। তখন আমাদের ছোকরা বয়স। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার মতো সাহস ছিলনা। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার ঠাকুরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছেও হতনা। ভাবতাম আমি তো সব প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলেই পেতে পারি।

পার্লারে বসে শুনতাম, কত বিচিত্র বিষয় নিয়েই না আলোচনা হত। কখনও কোরাণ-হাদিশ, কখনও বাইবেল বা পুরাণ, কখনও রাজনীতি-অর্থনীতি, কখনও বিচিত্র কোনও ঘটনা। আর মানুষের ব্যক্তিগত নালিশ, সমস্যা, সংকটের কথা তো ছিলই, ঠাকুর নিজে তখন খুব কম কথা বলতেন। শুনতেন বেশি। জনসমাগম বেশি হলেও কখনও তাঁর কোনও বিরক্তি দেখিনি। মানুষের নেশা ঠাকুরের বালককাল থেকেই।

ঠাকুর এত মানুষকে ভালবাসেন, তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তের কথা শুনি, তাও কেন মনে হত, ঠাকুর আমাকেও খুব ভালবাসেন! অথচ তিনি আমার দিকে দৃকপাতও তো বিশেষ করতেননা, কথাবার্তা তো দূরের ব্যাপার। আমার নামটাও তাঁর জানা ছিলনা। তবে ভালবাসা টের পেতাম কি করে? আর এইটেই রহস্য। এই মনে-হওয়াটা কি আমার নিছক কল্পনাপ্রসূত? আমাকে চেনেননা, নাম জানেননা, আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবগত নন, আমার দিকে দৃকপাত করার অবসর পাননা, কথাবার্তা হয়না, তবে ভালবাসলেন কি করে? এ কি আষাঢ়ে গল্প নয়? যুক্তি পরম্পরায় ভেবে দেখলে তাই, আত্মীয়তা নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই, পরিচয় নেই তবু ভালবাসা তো হাওয়ার নাড়ু! এই রহস্যের কিনারা করতে পারি সেই সাধ্য আমার নেই। কিন্তু একথাও সত্য যে, টের কিন্তু পেতাম। কোনও না কোনও ভাবে তিনি ঠিকই তাঁর অস্তিত্বের তরঙ্গ দিয়ে আমার মতো তুচ্ছ, অকিঞ্চনকেও নিশ্চিত স্পর্শ করতেন। ব্যাপারটা কাল্পনিক বা আনুমানিকও নয়। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে টের পাওয়া যায়।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের দেওয়া দৈনন্দিন কৃত্য বিষয়ক বিধি ও নিয়ম পালন না করলে এইসব সূক্ষ্ম বিষয়কে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যজন যাজন ইষ্টভৃতি, সদাচার, নাম-ধ্যানে অনুরাগ এবং ঠাকুরের

ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা এগুলো থাকলেই তিনি আমাদের কাছেই থাকেন।

ঠাকুর একমাত্র ভালবাসারই কাঙাল। সেই ভালবাসার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ধান্দাবাজি, চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা থাকলে ঠাকুর তার বশ হননা। কিন্তু নির্ভেজাল ভালবাসার ছিটেফোঁটা পেলেও তিনি তৃপ্ত হন। কিন্তু তাঁর জন্য ওই ভালবাসাটুকু আমাদের অন্তরে উৎপাদন করতে গেলেও কিন্তু আমাদের অনেক আয়াস-প্রয়াস, সংযম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। ভালবাসা বলতে শুনতে যত সোজা ব্যাপারটা তত সোজা নয়। ক্রমাগত আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে হৃদয় তন্মুখী হয় কই? শুধু আবেগই তো ভালবাসা নয়।

আমার দীক্ষার প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল। এই দীর্ঘ সময় ঠাকুরের ছায়ায় ছায়ায় চলবার চেষ্টা করেছি। ঠাকুর এই অকিঞ্চনকে যোগ্যতার অনুপাতে অনেক বেশি দিয়েছেন। আমি তাঁকে কিছুই দিয়ে উঠতে পারিনি। কত কাজ করার ছিল তাঁর জন্য, কত স্বপ্ন ছিল ঠাকুরের। কি ভাবে তা পূর্ণ হবে কে জানে।

ঠাকুর তাঁর অনুশাসনে পিতৃমাতৃভক্তিকে অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। পিতামাতাই হচ্ছেন গার্হস্থ্য গুরু। তাঁদের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা যার নেই তার গুরুর প্রতিও ভক্তি আসেনা, আর আধ্যাত্মিক জীবনও তার নিষ্ফলা। ঠাকুরের কথায়, পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান, সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ। নানা প্রসঙ্গে ঘুরেফিরে ঠাকুর বারবার পিতামাতার গুরুত্ব আমাদের জীবনে কতটা তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন ছড়ায়, বাণীতে, তেমনি আলাপচারিতায়।

আসলে এই যুগটাই একটা শ্রদ্ধাহীন, ভালবাসাহীন, নিষ্ঠাহীন, ধৈর্যহীন যুগ। মা বাবাকে ছেলে বা মেয়ে হয়তো তাঁদের যোগ্যতা বা পারগতা দিয়ে বিচার করে। এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উপেক্ষার ভাবটাও আজকাল খুব প্রকট। সন্তানের ভিতর শ্রদ্ধা বা ভালবাসা উদ্ভিন্ন করে তোলার জন্য মা-বাবাও তেমন প্রয়াসী নন। ফলে যা হওয়ার তা হচ্ছে। ঠাকুর কিন্তু এই ঢিলেমি পছন্দ করতেননা। সন্তানকে মা-বাবার প্রতি অনুরক্ত করে তোলার জন্য ঠাকুর ইষ্টভৃতির সঙ্গেই পিতৃভৃতি এবং মাতৃভৃতিরও প্রবর্তন করেছেন। সন্তান যদি রোজ নিয়মিত ইষ্টভৃতির সঙ্গে পিতৃ ও মাতৃভৃতি করে তবে সেই সন্তানের জেল্লাই হয় আলাদা। সেই সন্তান বেহাতি হয়না কখনও।

ঠাকুর তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যেও নানা কৌশলে পিতা ও মাতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাজন করেছেন বহুভাবে। কথায় কথায় বারবার মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা টেনে এনেছেন। ঠাকুরের মাতৃভক্তি তো কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুরের ছিল মাকে খুশি করার ধান্দা। আর তার জন্য কত মেহনত ও কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে! কিন্তু সেসব গায়েই মাখেননি।

মানুষের ভাল কি ভাবে হবে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আর তাই নিয়ে মতান্তর মনান্তর ঝগড়া কাজিয়ারও অভাব নেই। ঠাকুর চেয়েছেন, যার যে মতই থাকুকনা কেন তার বিরোধিতা না করে ভালটুকু আহরণ করে আনা। কমিউনিজম ধর্মীয় প্রবক্তাদের পছন্দের জিনিস নয়। কিন্তু ঠাকুর কমিউনিজমের মধ্যেও ফলিত ধর্মের রূপ প্রত্যক্ষ করতে বলেছেন আমাদের। সোজা কথা অস্তি ও বৃদ্ধির অনুকূল যা তাই ধর্ম। এ বাদে আর ধর্ম নেই।

এই সটান, সতেজ, মূর্ত ও বাস্তব বোধের ওপরেই শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনুশাসনবাদ প্রতিষ্ঠিত। অনুশাসনের ব্যাপারে ঠাকুর আপসহীন, অনমনীয়। বেশির ভাগ ধর্মীয় সংস্থা, আশ্রম বা আখাড়া শিষ্যদের ওপরে তেমন কোনও কঠোর নিয়ম চাপায়না। ফলে শিষ্যরা যেমনকে তেমন চলে। ফলে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েও তাদের লাভ হয় কমই। বিভিন্ন আশ্রমে ঘূরে, সাধুসঙ্গ করে, ভক্তদের সন্নিধানে থেকে আমি দেখেছি, খাদ্যে সংযম, আচারের শুদ্ধি, নাম-ধ্যান, গুরুভক্তির তেমন প্রয়াস নেই। অলৌকিক ঘটনাকেই তারা ফলিত ধর্ম বলে জানে। কিন্তু অলৌকিক দেখিয়ে লোককে খুব একটা প্রভাবিত করা যায় কি? অনেকের তো পাপ-পুণ্য সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা নেই। এ ব্যাপারেও ঠাকুর অনন্য। ঠাকুর কোথাও কোনও কথা অস্পষ্ট রাখতেননা। ঋজু ভাষায়, বাস্তব বোধের ওপর দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট অর্থ শিষ্যদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁর ব্যাখ্যা

এবং টিকা আমাদের পূর্ব ধারণা ও অস্পষ্ট অস্বচ্ছ বোধ এক ঝটকায় পরিষ্কার করে দেয়। আর কী সহজ, সুন্দর গ্রহণযোগ্য সেই ব্যাখ্যা।

ঠাকুর যখন হাসতেন সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠত। আর হাসি বা প্রসন্নতাটা যেন সারা শরীরেই ফুটে উঠত। আমার মনে হত ঠাকুর যখন হাসেন তখন যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে হাসেন। একটা দৃশ্যের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। এক সকালে ঠাকুরের পার্লারের এক কোণে বসে আছি। বিশুদা না প্যারীদা—কে যেন মনে নেই, ঠাকুরের হাতের নখ কেটে দিচ্ছিলেন। নখ কাটা হয়ে যাওয়ার পর কাটা ঠিক হয়েছে কিনা পরখ করার জন্য ঠাকুর বিশুদার হাতে একটু খামচি দিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর সে কী শিশুর মতো আহ্লাদের হাসি। ধী ও প্রজ্ঞার শীর্ষে অবস্থানকারী একজন ঐশী পুরুষ কিভাবে অমন শিশুর মতো মন খোলা প্রসন্নতার হাসি হাসতে পারেন তা আজও ভেবে পাইনা। নখ কাটার আনন্দও যে একটা আনন্দ তা যেন সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম। আর এত সামান্য কারণেও যে প্রসন্ন হওয়া যায় তাও বুঝলাম।

কিন্তু প্রসন্ন আমরা তাঁকে থাকতে দিতাম কই? আমাদের নানা দুঃখ, সমস্যা সংকটের ভারে তাঁকে আমরা তো সর্বদা কণ্টকিতই রাখতাম।

তবু বলি, ঠাকুর যে এক উজ্জ্বল, আনন্দময় ভাবভূমিতে অবস্থান করতেন তা কিন্তু মাঝে মাঝেই টের পাওয়া যেত। শরীরের আদি-ব্যাধি বা কষ্ট তার ছিলই। এসবই তিনি অর্জন বা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সমীপবর্তী মানুষের নানাবিধ ব্যাধি নিরাময় করতে গিয়ে। যৌবনে তাঁর হন্টনের বেগ ছিল এত বেশি যে অন্যেরা দৌড়ে তাঁর নাগাল ধরতে পারতনা। পরেশদা অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরার কাছে শুনেছিলাম, তিনি একদিন কোনও কাজ করতে গিয়ে একটা মোটা দড়ি কাটবার জন্য ছুরি-কাটারি জন্য এদিক-ওদিক খুঁজছিলেন। সেই সময়ে ঘটনাক্রমে ঠাকুর সেখান দিয়ে যেতে যেতে ব্যাপার কি জানতে চাইলে পরেশদা মোটা দড়িটার কথা বলতেই ঠাকুর সেটা হাতে নিয়ে দু-হাতে ধরে একটু দম নিয়ে টেনে পট করে দড়িটা ছিঁড়ে দিলেন। পরেশদা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইলেন। ওরকম মোটা দড়ি যে কোনও মানুষ হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে এ তাঁর কল্পনারও অতীত। এই অফুরান শক্তির উৎস তাঁর ভিতরেই ছিল। খুব প্রয়োজন না হলে তার পরিচয় কেউ পেতনা। ঠিক তেমনি আনন্দের উৎসও তিনি নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু নিরন্তর মানুষের সংসর্গে, মানুষেরই সুখ-দুঃখের ভাগী হতে গিয়ে তা চাপা পড়ে থাকত, সহজ উৎসার ঘটত না।

১৯৬৫ সালের মাঘ মাসের এক সকালে ঠাকুরকে প্রথম দেখার কথাটা খুব মনে পড়ে। কী যে অপরূপ এক আনন্দঘন উজ্জ্বল মানুষ। তাঁর শরীরের আভায় যেন সমস্ত জায়গাটিই দ্যুতিময় হয়ে আছে। ওই প্রথম দর্শনে বিস্ময় ও শিহরন আমার আজও গেলনা। তারপর বহুবার ঠাকুরের সন্নিধানে গেছি। খুব কাছে ঘেঁষতে না পারলেও কাছে-পিঠেই বিচরণ করেছি। আর বারবার বুঝতে চেষ্টা করেছি, কোন রহস্যময় কারণে তিনি এমনভাবে আমাকে টানেন। সেটা নিশ্চয়ই ভালবাসাই হবে। কিন্তু আমার তো কোনও গুণ নেই, কৃতী নই, বিদ্যাবত্তা নেই, সাধনা নেই, নিতান্তই সাদামাটা অচেনা এক ল্যাঙপ্যাঙে যুবক। তবু আমার মতো নিতান্তই গৌণ একজনকেও যে তিনি তাঁর কল্যাণদৃষ্টিতে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছেন তা আমি নির্ভুল টের পেতাম। আর ওই জন্যই ছিল ঠাকুরের ওপর আমার নেশা ও টান। বারবার ঠাকুরের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হত। যেতামও ঘন ঘন। শুধু ঠাকুরকে একটু চোখে দেখার জন্য। আর কিছু নয়।

সাধারণত তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম বা সাধুসন্তদের কাছে বিস্তর ধান্দাবাজও এসে জোটে। ঠাকুরের কাছেও এরকম ধান্দাবাজ মানুষের আনাগোনা দেখেছি। চৌধুরী ভিলায় পরেশদার কাছে আমরা গিয়ে উঠতাম। চৌধুরী ভিলা বেশ বড়সড় বাড়ি, পাঁচ-ছ'টা ঘর ছিল। সেইসব ঘরে যারা থাকত তাদের মধ্যে দুজন ছিল, যাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগতনা। কথাবার্তা শুনেই মনে হত এরা এখানে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এসেছে। এদের কখনও কাজ করতে দেখিনি। ঠাকুরের আনন্দবাজারে খেত আর আড্ডা মেরে বেড়াত। মুখে অবশ্য বড় বড় কথার অভাব ছিলনা। নানা কৌশলে অতিথিদের কাছ থেকে টাকা পয়সা চেয়ে নিত। এদেরই একজন পরে ঠাকুরের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করেছিল ব্যবসা করবে বলে। দ্বিতীয় জনও আদায়

উসুলের ফিকিরেই ছিল, সুবিধে না হওয়ায় আশ্রম ছেড়ে চলে যায়। এদের পরে আর ঠাকুরের কাছে আসতে দেখিনি। এই দুজনই নয়, আমাদের চেনাপরিচিতদের মধ্যে মতলববাজ বড় কম ছিলনা। আর ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বলয়ের মধ্যেও ছিল ঠাকুরকে শোষণ করার বিস্তর রক্তচোষা। ঠাকুর নম্রভাবে তাদের সতর্ক করতেন, শাসন বা প্রত্যাখ্যান করতেননা।

ইষ্ট বা গুরুর কাছ থেকে নিতে নেই, তাঁর জিনিস ভোগ করতে নেই, তাঁর কাছে কপট হতে নেই, এ তো আমরা জানি। তবু ঠাকুরের মতো প্রেমময় ক্ষমাশীল মহানরা বারংবার স্বার্থান্বেষীদের শিকার হন। ঠাকুরও বড় কম হননি। জ্ঞাতসারেই তিনি ঠকেছেন বহুবার, কিন্তু ঠগ বুঝতে পারেনি আসলে ঠকেছে সে নিজেই। সামান্য স্বার্থের জন্য জীবনের বৃহৎ প্রাপ্তিকে বিসর্জন দিয়েছে।

এই বৃহৎ প্রাপ্তির সঙ্গে অর্থ সম্পদের সম্পর্ক নেই। ঠাকুরকে ভালবেসে তাঁর সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে নিয়ে যে তাঁকে পূরণ করার প্রয়াস নিয়ে চলে, ঠাকুরের প্রতি যার অমলিন ভালবাসা আছে সে দারিদ্র্যের মধ্যেও মহা শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারে। আমি এরকম পরিবার বেশ কয়েকটা দেখেছি, যেখানে সামান্য আয়ের সংসারেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটে আছে। অভাব অনটনের মালিন্য বিন্দুমাত্র নেই।

ঠাকুর যে কী, তিনি যে কেমন তা বুঝে ওঠার মতো বোধশক্তি আমার নেই। তার কারণ, যে ভাবে তাঁর দয়া, তাঁর করুণা ও প্রেম ফলিত হয়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করা বা বুঝে ওঠা কঠিন। শুধু বুঝতে পারি তাঁর অনুশাসন মান্য করলেই জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথ অবারিত হতে থাকে।

ঠাকুরকে বুঝবার জন্য, অনুভব করার জন্য অন্যতর কোনও প্রয়াস নেই। নামধ্যান করতে করতেই একটু একটু করে বুঝসমঝ আসতে থাকে। সেই সঙ্গে ঠাকুরকে ভালবাসার চেষ্টা করতে হয়। আর এই ভালবাসা মানে হচ্ছে একদম মেঠো, ঘরগেরস্থালীর ভালবাসা। ঠাকুর দেবতা, পূর্ণাবতার তো বটেই কিন্তু তিনি আমাদের পরমতম আত্মার আত্মীয়ও। এইজন্যই ঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছেন মা-বাবা-পুত্র ইত্যাদিকে ভাবতে গেলেও যেন তাঁর মুখ মনে পড়ে।

পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল আমি ঠাকুরের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। এই প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরেই আমি নানাভাবে অনুভব করেছি তিনি আমার কাছেই আছেন। ঠাকুরের দয়া তো আছেই, তার ওপর যদি মানুষ তাঁর সাহচর্য কামনা করে তবে তাকে তিনি নিঃসঙ্গ হতে দেননা।

ঠাকুরের একটা ভারী মজার কথা আছে, যে যত অলস তার তত সময়ের অভাব। আর এই কথাটা আমার নিজের পক্ষে একশো ভাগ খাটে। অলস বলেই এবং কাজ ফেলে রাখি বলেই আমার সময়ের অভাব ঘটে সবচেয়ে বেশি।

ঠাকুরের আর একটাও এই প্রসঙ্গে মজার কথা হল, যে সময়ের কাজ সময়ে সেরে ফেলতে পারে তাকে সবসময়ে দেখা যায়, যেন বসে আছে। অর্থাৎ ব্যস্ত বলে বোঝাই যায় না তাকে।

ঠাকুর ভীমকর্মা মানুষ পছন্দ করতেন। আর নিজে ওরকম ভীমকর্মা ভক্ত অনেককে তৈরিও করেছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের ভক্তরা সাংগঠনিক যুগের শুরুতে যেসব নির্মাণের কাজ করেছিল তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। সৎসঙ্গ একসময়ে বড় ঠিকাদারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক সরকারি বরাত পেয়েছিল। সারা ব্রিজ নির্মাণে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। টিউবওয়েল বসানো, অন্যান্য বিনির্মাণ তো ছিলই, সৎসঙ্গের নিজস্ব গেঞ্জির কারখানারও একসময়ে বিশেষ সুনাম ছিল। ঠাকুর সম্ভবত অর্থোপার্জনের জন্য এসব করেননি। উদ্দেশ্য ছিল ভক্ত-কর্মীদের দক্ষ ও চৌখোস করে তোলা। কারণ, পরে এইসব কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়।

ঠাকুরের আয় বলতে মানুষ। অর্থোপার্জনের জন্য ঠাকুর অনেক কিছুই সংগঠিত করে তুলতে পারতেন। সৎসঙ্গ ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস থেকে শুরু করে বিশ্ববিজ্ঞান কিংবা তাঁত ও কাঠের আসবাব তৈরি ইত্যাদি পরিকাঠামোর অভাব ছিলনা। সৎসঙ্গের কর্মীরাই ইঁট তৈরি করতেন, বাড়িঘরও বানাতেন। কিন্তু সেসব কাজ আয় বৃদ্ধির জন্য নয়। স্বাবলম্বন শিক্ষাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অর্থোপার্জনের কোনও আয়াস প্রয়াসই ঠাকুরের ছিলনা বলে সৎসঙ্গ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। সম্পন্নতা যখনই দেখা দিয়েছে

তখনই ঠাকুর সেই কর্মকাণ্ড থেকে আশ্রমকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যে সব অর্থবান ভক্ত ঠাকুরের কাছে এসেছেন ঠাকুর তাঁদের কাছ থেকে কমই গ্রহণ করেছেন। বরং যাঁরা অকিঞ্চন তাঁদেরই পারগতা বৃদ্ধির জন্য ঠাকুর তাঁদের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়েছেন অনেক বেশি।

কার মঙ্গল কোথায় নিহিত আছে সেটা ঠাকুরই একমাত্র বুঝতে পারতেন। আমাদের ধারণাগুলো সাদামাটা যুক্তির পথে হাঁটে, ঠাকুরের তো তা নয়। যিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁর চোখে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই পূর্বাপর ধরা পড়ে যায় বলে মানুষকে তিনি যে উপদেশ বা পরামর্শ দেন তা আপাতমধুর বলে মনে না হলেও তারই মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের উদ্দিষ্ট মঙ্গল। ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষকে তার অনভিপ্রেত উপদেশ দিয়েছেন। যে তা মাথা পেতে নিয়ে পালন করেছে সে ঠকেনি। হয়তো কষ্ট করতে হয়েছে, কিন্তু আখেরে তার লাভই হয়েছে।

ঠাকুর কি ভাগ্য মানতেন? কিংবা জ্যোতিষবিদ্যা? বিস্ময়ের কথা হল, ঠাকুর অনেককে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলেছেন। অনেক সময়েই তিনি পণ্ডিতকে দিনক্ষণ লগ্ন জিজ্ঞেস করে যাত্রার সময়, কোনও কাজ আরম্ভ করার শুভ সময়, এমনকি নতুন গেঞ্জি পরবেন কিনা তা নির্ধারণ করতেন। আবার অনেক সময়ে অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ কিছুই মানতেন না। মাতা মনমোহিনী বৃহস্পতিবার যাত্রা নাস্তি মানতেন খুব। কিন্তু ঠাকুর এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন কিনা তা আমি খুঁজে পাইনি।

সত্যানুসরণ এবং ঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থরাজি পড়ার পর আমার মনে হয়েছে যে, ঠাকুর একেবারেই অদৃষ্টবাদী ছিলেননা। তাঁর সোজাসাপটা কথা ছিল, পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তা ছাড়া আর একটা অদৃষ্ট কদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হয়ে বসে থেকোনা। ঠাকুর ঋজু ভাষায় বলেছেন, যেমন কাজ করবে তোমার অদৃষ্টও তেমনি ভাবেই দেখা দেবে। আমরা জানি, কিম কুর্ব্বন্তি গ্রহা সর্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ। যার কেন্দ্রে বৃহস্পতির অবস্থান, অন্য সব গ্রহ তার কী করবে? বৃহস্পতি মানে হচ্ছে গুরু। অর্থাৎ যার জীবনের কেন্দ্রে সদগুরু অবস্থা করছেন গ্রহদোষ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

আর ঠাকুরও তাই বলেছেন, নানা প্রসঙ্গে। তবু তিনি জ্যোতিষ বিদ্যাকেও বাতিল করেননি। অনেক শিষ্যকেই তিনি শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করতে বলেছেন। অনেক সময়ে পঞ্জিকা দেখে কোনও কোনও বিষয়ে শুভ বা অশুভ লগ্নের খোঁজও নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যারা, ঠাকুরকে সর্বদা স্মরণে মননে রেখে যারা চলে তাদের যে কোনও ভয় নেই, সেই কথাও ঠারেঠোরে জানিয়ে দিতে ভোলেননি।

আমি এক সময়ে কিরোর বই পড়ে হাত-দেখা শিখেছিলাম। আমার নিজের কোষ্ঠীর গ্রহসন্নিবেশ খুব ভাল নয় বলে অনেক জ্যোতিষী জানিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে আমার জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর আস্থা বা নির্ভরতা কমে গেছে, তা বলে শাস্ত্রটি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ওই শাস্ত্রের কিছু সারবত্তাও আছে। তাত্ত্বিকভাবে শাস্ত্রটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে চললে প্রতিকূলতাগুলো অনুকূলতায় পর্যবসিত হয়ই কি হয়!

ঠাকুর যে প্রবল ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন একথা কারও অবিদিত নেই। ঠাকুর ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা মানতেননা। বলতেন, হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এ কথাগুলোই ভুল। বরং ওগুলি হল মত। মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানুষের ধর্ম একটাই। এক বই দুই নয়। আর সেই ধর্ম হল অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির ধর্ম। আর এইজন্যই ঠাকুর কোরাণ, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করিয়েছেন। প্রতিটি ধর্মের প্রতিই ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও হিন্দু।

সব ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল ঠাকুরের। আবার সেই সঙ্গে তিনি বৈশিষ্ট্যকেও মান্য করতেন। ধর্মের বিভিন্নতা বা বিরোধকে মানতেননা, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে এক এক যুগে এক এক বিশ্বাস ও মতের উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠাকে মানতেন। কিন্তু মূল সত্য হল, সব মানুষের ধর্ম একটাই। আর তা জীবনধর্ম। অস্তিত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ধর্ম। ঠাকুর যে কতটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন যে তার খ্রিস্টান এবং মুসলমান ঋত্বিকরা ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দেন।

ঠাকুরের অনুশাসনবাদ, তাঁর দেওয়া যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার সকলের জন্যই আবার মুসলমান শিষ্যদের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ার নির্দেশ দিতেন, খ্রিস্টানদেরও তাঁদের যথাবিহিত কৃত্য সম্পন্ন করতে বলতেন। ঠাকুর বলেছেন, All my ritwiks are brahmins. অর্থাৎ তাঁর সব ঋত্বিকই ব্রাহ্মণ, তা তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে বিপ্র বোঝায়না। ব্রাহ্মণ একটি বিশেষ জীবনচর্যা। জীবনদায়ী আচার-আচরণ পরায়ণতা, যা মানুষকে শুদ্ধ ও ধী-সম্পন্ন করে তোলে। ঠাকুরের কর্মকাণ্ড মানুষকে নিয়েই। প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও বিকারগ্রস্ততা থেকে মানুষকে তুলে আনাই তাঁর লক্ষ্য। মানুষ প্রকৃত অর্থে সংশোধিত না হলে ধর্মাচরণ অর্থহীন প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের উন্মাদনা ও তজ্জনিত হিংসা ও বিদ্বেষও আসলে বিকার।

ধর্মের যুক্তিযুক্ত ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছি। এত বাস্তববোধের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ আর কোথাও পাইনি। ধর্ম যে ভাবের ঘুঘু বা হাওয়ার নাড়ু নয় তা আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করার পর থেকেই। হিন্দু মুসলমানের যে বিভেদ আমাদের দেশের আবহাওয়াকে বহুকাল ধরে কলুষিত করে রেখেছে সেই বিভেদ-রেখা ঠাকুরের কাছে এসেই যেন মুছে গেছে। ইসলামের কী হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা করেছেন ঠাকুর। মুসলমান শিষ্যদের যখন ইসলামের মর্মকথা বোঝাতেন তখন তারাও অবাক হয়ে যেত। তাঁর খ্রিস্টান শিষ্যদের প্রায় এককাট্টা ধারণা ছিল ঠাকুরই যিশুখিস্ট।

১৯৬৫ সালে যখন আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে যাই তখনই দেখতাম ঠাকুর কোরাণের ওপর গবেষণা করাচ্ছেন। গবেষকরা ছিলেন দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সম্ভবত আরও কয়েকজন। সাধ্যমতো নানারকম বই আনিয়ে নিতেন ঠাকুর। এবং গবেষণা বিষয়ে নির্দেশ দিতেন নিয়মিত। ঠাকুরের "ইসলাম প্রসঙ্গে" গ্রন্থটি শুধু ভক্ত বা শিষ্যরাই পড়ত না, এই গ্রন্থটির ব্যাপক খ্যাতি ছিল বাইরেও।

সাধারণতঃ ধর্মগ্রন্থগুলির নানা অপব্যাখ্যা হয়ে থাকে। সেই বিকার বা বিকৃতির জটাজাল থেকে প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করে আনাই ছিল ঠাকুরের উদ্দেশ্য। ঠাকুরের বইয়ের সঞ্চয় ছিল বিস্ময়কর। আর কোনও আশ্রমেই বোধহয় গ্রন্থের এত সঞ্চয় ও সমাদর দেখিনি।

খবরের কাগজ থেকে বই সবই ঠাকুরকে পড়ে শোনানো হত, আর ঠাকুর সব কিছুই আনুপূর্বিক মনে রাখতেন। মাঝে মাঝে নানা শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে অনায়াসে নির্ভুল উদ্ধৃতি দিতেন, ইংরিজি প্রথাগতভাবে তেমন না শিখেও অসাধারণ ইংরিজি বাণী দিতেন।

মাঝে মাঝেই ভেবে বিস্ময় হত ঠাকুরের এই বিপুল প্রজ্ঞা কীভাবে সঞ্চয় হল। সারাক্ষণ তো মানুষের অভাব, অভিযোগ, কাঁদুনী শুনতে হচ্ছে।

একবার, আমি ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পরপরই কোনও সময়ে দেওঘরে গেছি। হঠাৎ একজন এসে বলল, আপনাকে ভোলানাথদা একটু ডেকেছেন। ভোলানাথদার কথা গুরুভাইদের কাছে শুনেছি। ঠাকুরের নির্দেশে এই ভোলানাথদাই বিপ্লবী রামশঙ্করকে বাঁচানোর জন্য সেই আমলে দিল্লিতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে দরবার করেছিলেন। তাঁর সেই সফল দরবার রামশঙ্করের প্রাণরক্ষা করেছিল। রামশঙ্কর ব্রিটিশদের চোখে বিপজ্জনক বিপ্লবী। তাই পালিয়ে ছদ্ম পরিচয়ে রামশঙ্কর পাবনায় ঠাকুরের আশ্রমে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর আত্মগ্লানি হওয়ায় তিনি ঠাকুরের কাছে নিজের পরিচয় দেন এবং তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তখন তাঁকে ঢাকায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ধরা পড়লেই ফাঁসি হবে, এটা জেনেও ঠাকুরের আদেশ পালন করেছিলেন রামশঙ্কর। আর তার পরেই ঠাকুরের নির্দেশে ভোলানাথদা রামশঙ্করকে বাঁচানোর কাজে ব্রতী হন।

খবর পেয়ে এক সকালে গেলাম ভোলানাথদার ঘরে। জামতলার ব্যারাকবাড়ির একখানা ছোটো ঘরে থাকতেন তিনি। একা মানুষ। আমি গিয়ে বসতেই আমার লেখালেখি সম্পর্কে একটু জানতে চাইলেন। বুঝলাম, তিনি সাহিত্যের পাঠক বা ভক্ত নন। আমি লিখি শুনে নিছক কৌতূহল। কিন্তু মানুষটি ভারী

সদালাপী। আমাকে পেয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলেন। একবার, কম বয়সে তিনি একটি অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই কাহিনিও বললেন। ভোলানাথদাকে ঠাকুরের পার্লারে বিশেষ দেখা যেতনা। নিজের ঘরেই নামধ্যান নিয়ে থাকতেন প্রচার-বিমুখ মানুষটি। তাঁর সান্নিধ্য বড় ভাল লেগেছিল।

ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে খুব বিখ্যাত বা তালেবর মানুষ বিশেষ দেখিনি। বরং সাধারণ মানুষই ঠাকুরের কাছে আসত বেশি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের মা-বাবা এরকম কয়েকজন ছাড়া অতি-বিশিষ্ট বা তেমন কেওকেটা কেউ ছিলনা। কিন্তু ভোলানাথদা, সুশীলদার মতো ধীমান এবং মনন সম্পন্ন মানুষেরা ছিলেন। শরৎ হালদার বা ননীগোপাল চক্রবর্তীর মতো স্থিতধী যাজকদেরও ফ্যালনা বলা যাবেনা। এঁরা অনেকেই নিজের জীবনের অনেক সম্ভাব্য সাফল্যকে উপেক্ষা করে ঠাকুরের কাছেই কষ্টের এবং আনন্দের জীবন যাপন করেছেন। কষ্ট বলতে অভাব ও অকিঞ্চনতার কষ্ট, আর আনন্দ বলতে ঠাকুরের স্বর্গীয় সান্নিধ্য। ঠাকুরের সঙ্গে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। সাহস ও দম না থাকলে পারা যায় না।

ঠাকুরের জীবনচর্যা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুবই কম। মাত্র বছর চারেক। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আর নিরবচ্ছিন্ন একটানা তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগও ছিলনা। কলকাতা থেকে যেতাম, তাও টাকাপয়সা হাতে এলে এবং ছুটিছাটা পেলে। বড় জোর তিন-চারদিনের জন্য গিয়ে হা-ঘরের মতো তাঁকে দর্শন করতাম মাত্র। কাছে গিয়ে বসে কথা-বার্তা বলার মতো সাহসও ছিলনা, সুযোগ পাওয়া যেত না। ঠাকুরের যত বয়স বাড়ছিল ততই তাঁর কাছে ভক্তদের সমাগম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তখন আমাদের ছোকরা বয়স বলে আমাদের আরও ব্রাত্য বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ওই সামান্য দর্শন, সামান্য শ্রবণ এবং দূরত্বের সাহচর্যটুকুও আজকাল যেন অফুরাণ রত্নভাণ্ডারের মতো মনে হয়। যেন এই চার বছরের সঙ্গই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সঞ্চয়।

দেওঘর অতি সুন্দর একটি শহর। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোরম, জলবায়ুও তেমনি স্বাস্থ্যকর। প্রথম দর্শনেই দেওঘর আমাকে মুগ্ধ করে দেয়। যতদূর মনে আছে প্রথমবার গিয়ে আমরা টাঙ্গায় করে দেওঘরের নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখেছিলাম। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে দেওঘরের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালেন ঠাকুর। সামান্য দু-চারদিনের জন্য গিয়ে আর ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করতনা। কিন্তু এরকমটাই হত আমার মায়ের বেলাতেও। দীর্ঘকাল হোস্টেল মেস-এ জীবন কাটিয়েছি। যখনই ছুটিতে বাড়িতে যেতাম তখন সারাদিন মায়ের কাছেই থাকতাম, মাকে ছেড়ে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে হতনা। মা যখন রান্নাঘরে রান্না করতেন তখন আমি চৌকাঠে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতাম। শুনলে লোকে হাসবে, ওইভাবে মায়ের কাছে বসে থাকতে থাকতে আমি বেশ ভাল রান্না করতে শিখে যাই।

মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের কোথায় যে মিল তা বুঝতে পারিনা। মায়ের মতো ঠাকুরের সঙ্গে তো আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলনা। এমনকি তাঁর দেহ কখনও স্পর্শ করিনি বা তাঁর খুব কাছাকাছি যেতেও পারিনি। কথাবার্তা যা হয়েছে তা যৎসামান্য। তবু মায়ের ওপর আমার যেমন টান, ঠাকুরের ওপরেও ঠিক তেমনই টান অনুভব করতাম। অথচ কারণটা বুঝতে পারতামনা। ভালবাসা তো সারাজীবনে একজন মানুষের নানা মানুষের সঙ্গে হয়। আর ভালবাসা নানা লক্ষণ বা আকর্ষণের ওপর নির্ভর করে। ঠাকুরকে কেন ভাল লাগে তা বুঝে উঠতে পারিনি তখন। এই একজন মানুষ যাকে দেখার জন্য কলকাতার মেসবাড়িতে সবসময়ে ছটফট করতাম। কবে যাবো দেওঘর তার জন্য আকুলি ব্যাকুলি। অথচ ঘনিষ্ঠতা নেই, আলাপচারিতা নেই, দর্শন পাওয়াই ভার।

আজও ঠাকুরের কথা, তাঁর স্মৃতি, তাঁর মুখখানা সারাদিনে কতবার যে আমাকে আচ্ছন্ন করে তার হিসেব নেই। তাঁর ভাবনাটাও যে কত উপভোগ্য! সবাইকে ছাপিয়ে তিনিই জ্বলজ্বল করেন মানসপটে।

দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই আমি ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে কারা বড় ভক্ত তা খুঁজে বেড়িয়েছি। প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ কী তা জানিনা, তবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলকেই লক্ষ্য করতাম। বেশি দেখতাম, তাদের কোথায়

কোন খামতি বা দোষ। মনে হত, প্রকৃত ভক্ত হলে সে তো আর আমাদের মতো এলেবেলে হবেনা। তার কাম, ক্রোধ, প্রতিক্রিয়া হবে নিয়ন্ত্রিত। সত্যনিষ্ঠ, অকুতোভয়, দৃপ্ত, দীপ্ত, শান্ত ও সৌম্য হওয়াই স্বাভাবিক। ঠিক সেইরকম খুঁজে বেড়াতাম, কিন্তু কোনও একজনের মধ্যে এতগুলি লক্ষণ পাওয়া যেতনা। সেইজন্য মাঝে মাঝে ভারী হতাশা আসত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, নাগমশাইরা ছিলেন, ঠাকুরের তেমন শিষ্য কই?

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, প্রজ্ঞা বা মেধা বা সিদ্ধিতে ঠাকুরের শিষ্যরা কেউই হয়তো স্বামীজীর ধারেকাছে নন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে এমন অবিশ্বাস্য সাহচর্য, পরামর্শ বা দিক নির্দেশ দিয়েছেন যা আমাকে বিপন্নতা থেকে বারবার রক্ষা করেছে। আরও একটা ব্যাপার ঘটত। মন খারাপ বা মানসিক অবসাদের সময় গুরুভাইরা কেউ এলেই মন ভাল হয়ে যেত। গুরুভাইদের প্রতি আমার এই পক্ষপাত দেখে আমার স্ত্রী আমাকে এখনও ঠাট্টা করেন।

ঠাকুরের কোনও বিবেকানন্দ নেই কেন, এই প্রশ্ন একসময়ে আমারও মনে হত। একজন ওরকম মানুষ থাকলে ঠাকুরকে আর যাজকের জন্য অপেক্ষা করতে হত না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখেছি, বিবেকানন্দের মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও শক্তির যে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা ধারণ করার মতো কটা মানুষ ভারতবর্ষে আছে? তাঁর রচনাবলী পড়তে গিয়ে আমিই তো কতবার দিশাহারা হয়ে গেছি। বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করে সবাই, কিন্তু তাঁকে ঠিকঠাক অনুসরণ বা আত্মস্থ করার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? প্রজ্ঞাবান, শিক্ষিত এবং মেধাবী যাঁরা তাঁরাই তাঁকে খানিকটা অনুধাবন করতে পারেন। ফলে দেখা যায়, সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষ, অশিক্ষিত, মেধাহীন এবং বিভ্রান্ত মানুষেরা বিবেকানন্দকে অবলম্বন করতে অপারগ। ঠাকুর কিন্তু অনায়াসে সমাজের একেবারে নিচের স্তরেও বোধগম্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সমস্ত আদিবাসী বা প্রাকৃত জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরিত করেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। এই জনগোষ্ঠীর কাছে ঠাকুর ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছেন। স্বামীজীর শিক্ষা কিন্তু এই স্তরে অনুপ্রবেশ করেনি।

তা বলে ঠাকুরের অনুশাসন সহজও নয়। ঠাকুরের বাণীর মধ্যে মানুষের যে সব জটিল ও সূক্ষ্ম মনো-বিশ্লেষণ আছে কিংবা দৃষ্টিচক্রের যে দুরধিগম্য ব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি ঠাকুরের অনন্যসাধারণ ভাষা তা বোঝা সহজ নয়। বরং অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আবার ঠাকুরের সহজিয়া একটা দিকও আছে যা সর্বসাধারণের শুধু বোধগম্যই নয়, অত্যন্ত আকর্ষক। ঠাকুর একাই যা কিছু করেছেন, তেমন সহযোগী বা সহায়ক পাননি। তাঁর কোনও বিবেকানন্দ ছিলেননা ঠিকই, বোধহয় তার দরকারও হয়নি। তার কারণ, ঠাকুর এক এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ আবির্ভাব। তাঁর রথের রশি টানছে আপামর মানুষ।

মহাপুরুষরা বড় একটা বেরসিক হননা। শুষ্ক তাত্ত্বিকতা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায়না। বরং রঙ্গ-রসিকতা, লঘু সময় যাপান তাঁদের লীলারই অঙ্গীভূত। ঠাকুরকেও দেখেছি, কী সুন্দর মজা করতেন এবং মজা পেতেন। যখন হাসতেন তখন মুখে চোখে যে অভিব্যক্তি হত তা মনোমুগ্ধকর। আর হাসির ভিতর দিয়ে তাঁর অমলিন হৃদয়টিই যেন উন্মোচিত হত। আশ্রমবাসী কতিপয় কলহপরায়ণ বা কোপন স্বভাবের মহিলাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে সেই ঝগড়া শুনতেন। সবটাই অবশ্য আপসে। যুযুধান মহিলারাও জানতেন যে এটা প্রমোদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ঠাকুরের রসবোধের গভীর পরিচয় পাই তাঁর আলাপচারিতায়। সুশীল বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রভৃতির সংকলন গ্রন্থগুলিতে ঠাকুরের সরস বাক ভঙ্গিমার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দীপরক্ষীতেও বেশ কিছু সরস মন্তব্য রয়েছে। প্রফুল্লকুমার দাসের 'আলোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থগুলিতে কিছু কম। তার কারণ প্রফুল্লদা ঠাকুরের সামনে বসে তাঁর নিজস্ব শর্ট হ্যাণ্ডে নোট নিতেন। বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতেন অনেক পরে। পরে বলতে হয়তো বৎসরাধিক কাল। ফলে টাটকা কথার জাদুটা তাতে ততটা থাকতনা। ঠাকুরের কাছাকাছি অর্থাৎ তাঁর পার্লারে বসবার যে সামান্য সুযোগ পেয়েছি তাতেই সরস ব্যক্তিত্বের এবং অপরূপ অভিব্যক্তির পরিচয় পেতে অসুবিধে হয়নি।

ঠাকুর সবসময়ে হাস্যময় বা প্রসন্ন তো থাকতেননা। বরং তাঁর উদ্বেগ, অস্থিরতা বেশিই ছিল। অত ভালবাসা যাঁর, উদ্বেগ অশান্তি তো তাঁর থাকবেই। আর আমাদের মতো গুটিকয়েককে নিয়ে তো তাঁর ভালবাসার পরিধি নয়। মানুষ ছাড়িয়ে গাছপালা, কুকুর, বেড়াল, এমনকী পোকামাকড়টার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর টান। ছাগলের পেট খারাপ হয়েছে জেনেও তাঁর সে কী উদ্বেগ! অনেক সময়েই গিয়ে দেখেছি ঠাকুর বিষণ্ণ, আনমনা, উদ্বিগ্ন, অবসন্ন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁর চোখে করুণা আর মায়া যেন চুঁইয়ে পড়ত। বাস্তবিক জীবনে আমি এরকম আর কাউকে কখনও দেখিনি। ঠাকুরকে দেখার আগেও না, পরেও না।

সমস্যা হত ঠাকুরের পারিপার্শ্বিকটা নিয়ে। ঠাকুরের পাশাপাশি বা কাছাকাছি যাদের অবস্থান, অর্থাৎ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ সেখানে এমন কাউকে খুঁজে পেতাম না যার ভিতরে ঠাকুরের প্রতিবিম্ব আছে। আসলে ভক্তজনকে খুঁজতাম নিজের স্বার্থেই। ভক্তের সঙ্গ করলে আমার বিশ্বাস, ভক্তির জোর বাড়বে। কাউকে পাইনি এমন নয়। কিন্তু শতকরা একশ ভাগ নির্ভেজাল মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত। যদি সুযোগ থাকত তাহলে ঠাকুরকেই জিগ্যেস করতাম তাঁর বড় ভক্ত কে!

ডিসিপ্লিন থেকেই ডিসাইপাল কথাটার উৎপত্তি, এটা ঠাকুরই বলেছেন। এই ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা কী তা বোধহয় ঠাকুরের কাছে না গেলে বুঝতে পারতামনা। প্রথমেই যেটা চোখে পড়েছিল, ঠাকুরের বাহুল্যহীন জীবনযাপন। দ্বিতীয়ত, সব কিছুই যেন অতি যত্নে সাজিয়ে রাখা এবং অতুলনীয় পরিচ্ছন্নতা। ধুলোময়লা মলিনতার চিহ্নও কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। অথচ তাঁর কাছে মানুষের আনাগোনার শেষ নেই।

ঠাকুরের শরীর থেকে যে একটা বিচ্ছুরণ ঘটত তা আমি অত্যন্ত প্রখরভাবে টের পাই, দীক্ষার দিন দুপুরবেলায়। তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম ও শেষ "প্রাইভেট" করতে গিয়েছিলাম। "প্রাইভেট" অর্থে নিভৃতে কথা। হামাগুড়ি দিয়ে বোধহয় ঠাকুরের চার ফুটের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। আর তখনই আমার শরীরে একটা শিরশিরানি দেখা দিল। মৃদু সূক্ষ্ম কম্পন যা আমার শরীরের ভিতর থেকে আসছে না, পরিমণ্ডল থেকে আসছে। যখন তাঁর কাছ থেকে সরে এলাম তখনই কম্পনটা উধাও হল। ঠাকুরকে ঘিরে যে একটা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির বলয় ছিল তা সেই দিন প্রথম অনুভব করেছিলাম। পরে হাউজারম্যান এবং আরও দু-একজনের কাছে এরকম অনুভূতি হওয়ার কথা শুনেছি।

আমার ধারণা ওই কম্পন ঠাকুরের ভিতরে অবিরল স্পন্দিত সৎনামের অনুরণন। কিন্তু যাঁরা ঠাকুরের নিকট সাহচর্যে সর্বদাই অবস্থান করতেন বা সেবা করতেন তাঁরা টের পেতেন কিনা জানিনা। পাওয়াই তো সম্ভব। ঠাকুরের খুব কাছাকাছি ওই একবারই গিয়েছিলাম! আর কখনও অত কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে আমার একটা গোপন ইচ্ছে ছিল অন্তত একবার তাঁকে একটু ছোঁয়ার। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সুযোগ পেলেও হয়। কিন্তু ঠাকুরের নিষেধ আছে, পায়ে হাত দিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করতে নেই। ফলে আকাঙ্ক্ষাটা আর পূরণ হয়নি।

তাঁকে স্পর্শ করতে পারলেই যে পাপ-তাপ কেটে যাবে তা নয়। আর ওরকম কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না আমার। কিন্তু প্রিয়জনদের স্পর্শ করার ভিতরেও একটা তৃপ্তি আছে। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটুকুই।

ঠাকুরের কাছে তো চাহিদা নিয়েই গেছি। নিজের স্বার্থসিদ্ধি, সংকট থেকে ত্রাণ এবং বাঁচার উদ্দেশ্য, এ সবই ছিল আমার প্রার্থিত জিনিস। ঠাকুর আমাকে রক্ষা করলেন, এবং জীবনকে বইয়ে দিলেন অন্য খাতে। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব হল তা আজ অবধি বিচার-বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারিনি। আমরা যে যুক্তি পরম্পরার ওপর নির্ভর করে চলি, ঠাকুরের যুক্তিশাস্ত্র তার থেকে আলাদা। তাই বোঝা কঠিন, ঠাকুর কীভাবে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করছেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। ঠাকুরের দয়া পেতে হলে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হয়। নইলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রচিত হতে বাধা হয়। আমি আর কিছু পারিনি বটে, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে হলেও ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালন করার চেষ্টা করে গেছি। আজও ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি কিছু কিছু ঘটে যায়। কিন্তু মোটের ওপর সচেতনভাবে তাঁর অনুশাসন লঙ্ঘন করিনা। সেটা খানিকটা ভয়ে, যতটা না

ভক্তিতে। ভয়ের একটা কারণ হল, ঠাকুর যখন দেহে ছিলেন তখন তাঁর অন্তর্যামিত্ব এতরকমভাবে টের পেতাম যে, ভয় হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। কেউ আমার মনের কথা সব জানতে পারছে এটা তো স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নয়। তবে যিনি জানছেন তিনি যদি ঠাকুরের মতো ত্রিকালজ্ঞ, আমান পুরুষোত্তম হন তবে অবশ্য ভয় হলেও ভরসাও থাকে। ঠাকুর দেহাতীত হওয়ার পরও কিন্তু তাঁর উপস্থিতি, তাঁর নৈকট্য, তাঁর ঈশারা ইঙ্গিত এত বেশি পাওয়া যায় যে, মনে হয় আমাদের চেয়েও তিনি অনেক বেশি বেঁচে রয়েছেন। অনেক বেশি জীয়ন্ত।

ঠাকুর একসময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বলতে গেলে ঠাকুরের ওই একবারই কোনও পেশা গ্রহণ করা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ক্রমে তাঁর প্রবল পসার হয়েছিল। তৎকালেও তাঁর ভিজিট একশ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। আমার হিসেবমতো তাঁর ডাক্তারীর মেয়াদ দু-তিন বছরের বেশি ছিলনা। কারণ পঁচিশ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা হল তাঁর। আগ্রার সরকারসাহেবের নির্দেশ মাতা মনমোহিনীই তাঁকে সৎনাম দিয়েছিলেন। আর তার পর থেকেই কিছু দিনের মধ্যে ঠাকুরের জীবনধারায় প্রবল পরিবর্তন এল। কীর্তন এবং ভাবসমাধির যুগ সূচীত হল। ঠাকুর ডাক্তারি ছেড়ে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করলেন। বরণ করে নিলেন দারিদ্র ও কৃচ্ছ্রতাকে। দীর্ঘ কাল এক অকিঞ্চনতার মধ্যেই কালাতিপাত করেছেন ঠাকুর। কিন্তু তবু আর ডাক্তারিকে পেশা হিসেবে ফিরিয়ে আনেননি।

ঠাকুরের বামনাই বৃত্তিই শেষ অবধি নিয়ে এল সচ্ছলতা। ধীরে ধীরে সৎসঙ্গের সম্পন্নতা দেখা দিল। মানুষের ভক্তি ও আকুতির নিবেদনই গড়ে তুলল অতুল সম্পদ। কিন্তু ঠাকুর এতই বিষয়-বিরাগী ছিলেন যে, হিমাইতপুর থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে যখন আকস্মিক দেওঘরে চলে এলেন তখন আশ্রমের বিশাল সম্পত্তি বা ঐশ্বর্যের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেননা। পরে পাকিস্তান সরকার যখন আশ্রম অধিগ্রহণ করার পর শত্রু-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে চায় তখনও ঠাকুর সেই বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করেন।

টাকার পিছনে কখনও তো ছোটেননি ঠাকুর, কিন্তু টাকাই তাঁর পিছনে ছুটেছে। ফলে প্রায় অকিঞ্চন অবস্থায় দেওঘরে এসে যে আবার প্রবল অর্থকষ্ট এবং অব্যবস্থাকে বরণ করে নিলেন এটার ভিতর দিয়ে হয়তো ভক্ত শিষ্যদের নতুন শিক্ষারও সূচনা হল। শূন্য থেকে শুরু হল সংগঠনের কাজ। ধীরে ধীরে আবার সম্পদ সৃষ্টি হল। সৎসঙ্গের নামে এত মানি অর্ডার আসতে লাগল যে ডাকঘর তা সামাল দিতে পারতনা। বেশ কয়েক বছর আগে এক সমীক্ষায় ঘোষণা করা হয়েছিল, দেওঘরের সৎসঙ্গ ডাকঘরেই ভারতে সবচেয়ে বেশি মানি অর্ডার আসে। কিন্তু সেই অতুল সম্পদের অধিকারী হয়েও ঠাকুরের জীবনযাত্রা এত সাদামাটা, এত বাহুল্যহীন এবং অনাড়ম্বর যে, বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর জীবনদর্শন যা, তাতে অবশ্য ওই সম্পদ তাঁর ভোগের জন্য নয়। তাহলে কোন কাজে লাগবে? ঠাকুর নিয়ম করেছিলেন, যে এলাকা থেকে যত ইষ্টভৃতি আসে তার এক তৃতীয়াংশ সেই এলাকারই উন্নতির জন্য পাঠাতে হবে। ঠাকুরের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলে আজ কিন্তু অনেক এলাকারই চেহারা পাল্টে যেত।

ঠাকুরের নির্দেশ পালিত হলনা বলেই কিন্তু সমাজে ঈপ্সিত পরিবর্তন ঘটতে পারলনা। মন্দির বা আশ্রম তৈরি করারও একটা উদ্দেশ্য হল তার ভিতর দিয়ে যাজন ও সেবা চারিয়ে মানুষকে টেনে আনা এবং বিনায়িত করা। বলতে সহজ, কিন্তু কাজ অতীব কঠিন এবং নিরলস আয়াস-প্রয়াস-সাপেক্ষ। ঠাকুর একা এক জায়গায় বসে থেকেই মানুষকে টেনে আনতেন এবং শূন্য থেকে একজন মানুষকে পূর্ণত্বের পথে চালিত করতেন। সেই মধুর-তীব্র ব্যক্তিত্বেরও তো বিকাশ ঘটলনা কারও মধ্যে। ঠাকুর তো সংগঠন করবেন বলে আসেননি। মানুষের অভ্যন্তরে নিশ্চেষ্ট যে সব বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে চেয়েছিলেন। আর ওই জাগরণ না ঘটলে সংগঠন কিছুই করে উঠতে পারে না।

ঠাকুর আর তাঁর সংগঠন কি এক? ঠাকুর কখনোই কোনও সংগঠন তৈরি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হিমাইতপুরে যখন ঠাকুরকে ঘিরে অনেক মানুষ জড়ো হল তখনও ঠাকুর কোনও সংগঠন তৈরির কথা বলেননি। কিন্তু ঠাকুরকে কেন্দ্র করে জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সেটা হল ঠাকুরের

প্রতি তাদের আনুগত্য, আনতি ও ভালোবাসা। আর এই বন্ধনই সব সংগঠনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। ঠাকুর নন, এই জড়ো হওয়া মানুষদের সংগঠনে উত্তীর্ণ করলেন মাতা মনমোহিনী। তিনিই তাঁর গুরুর আশ্রমের অনুরণনে এই সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন সৎসঙ্গ। ঠাকুর আপত্তি করেননি। সৎসঙ্গকে মেনে নিয়েছিলেন।

ঠাকুরের সৎসঙ্গ প্রথম দিকে ছিল একটি ঢিলাঢালা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল মাত্র। ঠিক সাংগঠনিক প্রাতিষ্ঠানিকতা তার ছিলনা। ঠাকুরের ইচ্ছার যথাসাধ্য রূপায়ণ ছাড়া আর অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিলনা তার। কিন্তু সৎসঙ্গ যত প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করতে লাগল, যত অর্থ সম্পদ বাড়তে লাগল, ততই যেন ঠাকুর আর সৎসঙ্গ হয়ে দাঁড়াল দুটো জিনিস। আরও পরে ইনকাম ট্যাক্স থেকে মুক্তি পেতে ঠাকুর যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর যা আয় তাই সৎসঙ্গের, তখনই সৎসঙ্গের সঙ্গে ঠাকুরের একটা পার্থক্য রচিত হয়ে গেল। সৎসঙ্গের কোনও অর্থভাণ্ডার থেকে ঠাকুর আর কিছুই গ্রহণ করতেননা। তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ছিলনা। প্রতিদিনই তাঁর ভোগের জন্য ভক্তরা নানা উপচার নিয়ে আসত। কিন্তু সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ওই পার্থক্য বরাবর থেকে গেল। এমনকী সৎসঙ্গ পরিচালনার ব্যাপারেও ঠাকুরকে কোনও উচ্চবাচ্য করতে আমি তো শুনিইনি, আর কেউ শুনেছে বলেও জানিনা।

আসল কথা হল, প্রেরিত পুরুষেরা সংগঠন করতে আসেননা। গোটা বিশ্বসমাজই তাঁদের সংগঠন। কিছু মানুষ নিয়ে তৈরি সংঘর সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি বাঁধা পড়বেন কেন? অনেকে ঠাকুরকে সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা বলে জানে। এই জানাটাই ভুল। সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়া তো তাঁর কাজ নয়। তিনি তো এসেছেন গোটা মনুষ্যসমাজ ও জীবজগতের জন্য। সঙ্ঘপ্রধান অভিধায় তাঁকে বেঁধে রাখলে ঠাকুরকে যে ছোটো করে ফেলা হয়। ঠাকুরকে তাঁর শরীরে বা শরীরী রূপে যখন দেখেছি তখনও মনে হত যেন এক সীমাহীন মানুষ। যেন বা দেহটুকুর মধ্যেই তিনি শেষ হয়ে যাননি, বরং ওই দেহ থেকে উপচে পড়ে সারা পারিপার্শ্বিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর স্পন্দন, তাঁর দীপ্তি, তাঁর করুণা, তাঁর প্রেম।

এসব যে সাদামাটা ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব তা কিন্তু নয়। ব্যাখ্যা করবই বা কি করে? তাঁর অপার রহস্যকে কি জানি? ঠাকুরের অস্তিত্বের গভীরতা ও ব্যাপ্তিকেই বা পরিমাপ করব কীভাবে? নিবিষ্ট চিন্তা, ধ্যান এবং অখণ্ড জপ করলে হয়তো খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কষ্টটুকুই বা স্বীকার করতে চায় কয়জন?

আমাদের আধার ছিলনা বলে ঠাকুরকে সম্পূর্ণ ধারণ করার সাধ্যই হলনা আমাদের। কারও কারও হয়তো আধার ছিল, কিন্তু প্রয়াস ছিলনা। তাই আমরা ঠাকুরকে খুব অল্পই পেলাম।

দীক্ষার পর থেকেই এক বিশাল জনসমষ্টির সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল। তা বলে রাতারাতি নয়। ধীরে ধীরে গুরুভাইদের সঙ্গে পরিচয়, আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এবং প্রায় আত্মীয়তার মতো সম্পর্ক স্থাপিত হতে লাগল। মাত্র একজন মানুষের সূত্রে এত মানুষকে পেয়ে যাওয়া আমার জীবনে এক পরম বিস্ময়। ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি বলে হাজার হাজার মানুষ যে আপন হল এটা অন্যভাবে তো সম্ভব ছিলনা! আমার একটা সাদামাটা, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত একটু নির্জন একটা জীবন ছিল। রিলেশন বা সম্পর্ক বলতে ওই বন্ধুত্বটুকুই। এবং সেটাও তেমন ঘাতসহ নয়। বন্ধুত্ব হুট করে ভেঙেও যায়। কিন্তু সৎসঙ্গ এবং ঠাকুরের সূত্রে যাদের পেলাম, তাদের জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থান, বুদ্ধিবৃত্তি বা রুচি কিছুই আমার মতো না-হওয়া সত্ত্বেও শুধু ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য বলেই তাদের সঙ্গে আমার এক সুদৃঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক রচিত হয়ে গেল। আজ অবধি আমার গুরুভাইরা অধিকাংশই আমার লেখালেখির তেমন খোঁজ খবর রাখেননা, তাঁরা আমার পাঠকও নন, তবু আমাকে তাঁরা অতি আপনজন বলেই মনে করেন। আমার দায়ে দফায় বিপদে আপদে এঁরাই বুক দিয়ে এসে পড়েন। ঠাকুরের দয়াতেই এই বিশাল এক আত্মীয়সমাজকে আমি লাভ করেছি। পৃথিবীর যে প্রান্তেই গেছি, গুরুভাইরা সেখানেও খবর পেলেই এসে হাজির হয়েছেন।

তার চেয়েও বড় কথা, ঠাকুরের যাজনকাজে গ্রামেগঞ্জে বিস্তর পরিভ্রমণ করার ফলে আমার গ্রামবাংলা সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। এবং তা আমার লেখার কাজে প্রভূত সহায়ক হয়েছে। ঠাকুরকে না ধরলে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অনেকটাই দীন হয়ে পড়ত। সোজা কথা, ঠাকুর আমার জীবনযাপনকে আদিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। আমি ঘরকুনো মানুষ, ঠাকুর আমাকে টেনে বের করে না আনলে আমার জীবন হত কূপমণ্ডুকের মতো।

ঠাকুরের কাজের অন্যতম হল তাঁর বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা বা বক্তৃতা দেওয়া। সারা বছরই বাংলা, আসাম, কাছাড়, ত্রিপুরা এবং অন্যত্র শহরে, গ্রামে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ঘরে ঘরে সৎসঙ্গ তো আছেই। ঠাকুরের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অনেকেই বেশ বিখ্যাত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র হালদার, ননীগোপাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, জনার্দন মুখোপাধ্যায়, চুনীলাল রায়চৌধুরী প্রমুখ সৎসঙ্গ জগতের বাইরেও বাগ্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাগ্মীতাকে ঠাকুর কোনওকালেই খুব একটা গুরুত্ব দেননি। লম্বা ভাষণও তাঁর অপছন্দ ছিল। যাজন করার মানে যে বাগবিস্তার করা নয় তা তিনি বহুভাবে বলেছেন। চারিত্রিক বিনায়ণ, ইষ্টের প্রতি গভীর টান ও নির্ভরতা, গুরুভক্তি এবং বিশ্বাস, সদাচারপরায়ণতা, সংযম, ক্লেশসুখপ্রিয়তাই প্রকৃতপক্ষে লোককে চুম্বকের মতো টেনে আনে। কথার ফুলঝুরি খুব একটা মানুষের গভীরে যায় না। তবে বক্তৃতারও কিছু উপযোগিতা আছে, শুধু বাকসর্বস্ব না হলেই হল। নিজের ক্ষেত্রেই অনুভব করি, বক্তৃতা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও তাতে যেন অভীষ্ট যাজনের ক্রিয়াটা হয়না। লোকে প্রশংসা করল কিন্তু মাথা পাতলনা।

কথা দিয়ে সব খামতি পূরণ করা যায়না। কাজেই বক্তৃতা বা ভাষণ যতই ভাল হোক না মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আনতে পারে কমই। আমার যতদূর মনে হয়, ঠাকুর কথার চেয়ে কাজকেই অধিক গুরুত্ব দিতেন।

আমার বেশ ঘনিষ্ঠ সৎসঙ্গের একজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। বেশ কয়েকবার তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হই। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষটির বিস্তর খামতি লক্ষ্য করতাম। বলার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের এতটাই ফারাক যে, ভারী আহত বোধ করতাম। নিত্য করণীয়গুলিতেও তাঁর ঢিলেমি ছিল। ঠাকুর বিষয়ে এমন কিছু গল্প বা ঘটনার উল্লেখ করতেন যেগুলো সত্য নয়, গালগল্পমাত্র, তাঁরই কল্পনাপ্রসূত। বুঝতে অসুবিধে নেই যে, তিনি বাগ্মীতা অর্জন করেছেন অনুশীলনের মাধ্যমে, আত্মিক সাধনার দ্বারা নয়। ফলে যা বলতেন তা তাঁর নিজের উপলব্ধিজাত নয়।

ঠাকুর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রায়ই বলতেন। ধীর হয়ে লাগোয়া থাকতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে খুব তাড়াহুড়ো করে ঊর্ধ্বারোহণ করা যায় না। তার কারণ, মানুষের নিজের ভিতরেই নানা লড়াই আছে। অভ্যস্থ সংস্কার, অন্যের প্রভাব, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির প্ররোচনা, বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং অহংবোধ। নামধ্যান প্রবলভাবে না করলে অভ্যন্তরের বৈরীদের জয় করা যায়না। কাজেই ভক্তকে ধৈর্য ধরে আগে ভিত তৈরি করতে হয়। আমার মতো নকড়াছকড়া শিষ্যকেও স্রেফ তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও কত কসরৎ করতে হয়েছে। এখন বুঝতে পারি ঠাকুরের সঙ্গে তাল রেখে চলা কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য।

বক্তা হতে গেলেও তাই, আগে ভক্ত হতে হয়। ঠাকুর একবার কথা প্রসঙ্গে এক ভক্তের কথা বলেছিলেন। সে ভাল করে কথাই বলতে পারত না জিভে দোষ থাকায়। তেমন বুদ্ধিশুদ্ধিও ছিলনা। কিন্তু ঠাকুরকে গভীরভাবে ভালবাসত। আর তার জোরেই সে হাত পা নেড়ে, অস্ফুট উচ্চারণে যে যাজন করত তাতেই বহু মানুষ প্রভাবিত হয়ে দীক্ষা নিয়ে নিত। এই ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুর এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত ভক্তের বাগ্মীতার প্রয়োজন হয়না। তার সত্তাই মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারে। কথার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আচরণের প্রয়োজন আরও বেশি। ঠাকুরের ওপর টান ভালবাসা হলে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বেরিয়ে এসে মানুষের আঁতে তরঙ্গ সঞ্চার করবে। ফুলেল বাগবিন্যাসে মানুষের ফাঁকা বাহবা পাওয়ার চেয়ে তা অনেক বেশি কার্যকর।

মনুমার কথা বড্ড বেশি মনে পড়ে। এই মহিলাকে দেখতাম এক চা আর খাবারের দোকানে খদ্দেরদের নানা পরিষেবা দিচ্ছেন। সেই দোকানটার চা ও চপ ভাল ছিল বলে আমরা দেওঘরে গেলে বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ গুরুভাইরা এই দোকানেই গিয়ে বসতাম। সৎসঙ্গের প্রধান ফটকের অদূরেই ছিল দোকানটা। মনুমা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল বেঞ্চ পরিষ্কার করতেন, জল দিতেন, শালপাতার ঠোঙায় চপ মুড়ি এনে দিতেন। এই রোগাপানা, বয়স্কা বিধবা মহিলাটির ভাবভঙ্গির মধ্যেই একটি ভারী দীন ভাব ছিল। মুখে সর্বদা সরল হাসি।

আমাদের জলযোগ হয়ে গেলে মনুমা প্রায়ই জিগ্যেস করতেন, আমরা নাড়ু বা মোয়া খাবো কিনা। আমরা রাজি হতাম না। মনুমা হেসেই নিবৃত্ত হতেন। আমরা জানতাম তিনি ওই দোকানে হয় কাজ করেন, নয়তো অংশীদার। পরে জানতে পারি, উনি কোনওটাই নন। সেবাটুকু এমনিই দান করেন, ওঁর আসল বৃত্তি হল মোয়া নাড়ু বানিয়ে বিক্রি করা। জেনে খুব কষ্ট হয়েছিল। মুখে যে খুব ঠাকুরের কথা বলতেন তা নয়, কিন্তু ওঁর ভিতরে একটা তদগত ভাব লক্ষ্য করতাম। আর ওঁকে চাক্ষুষ করলেই একটা প্রসন্নতা অনুভব করতাম। মনে হত, উনি ঠাকুরের লোক। ওঁর চোখে নাম-ধ্যানের একটা ছাপও লক্ষ্য করেছি।

পরে শুনেছি, ঠাকুর তাঁর ভক্তদের মধ্যে যে দু-একজনের কথা বলেন তাদের মধ্যে মনুমা আছেন। যতদূর জানি, মনুমার কেউ ছিলনা। একা, অনাথা, বিধবা, সন্তানহীনা। কিন্তু কখনও তাঁকে ভারাক্রান্ত দেখিনি। নম্র, ভদ্র, সবসময়ে মুখে একটু লাজুক হাসি।

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের সম্পর্ক তো বহিরঙ্গে বোঝা যেত না। সম্পর্ক রচিত হয় অন্তরে, উপলব্ধির জগতে। ঠাকুর হয়তো কাউকে খুব ডাক-খোঁজ করছেন বা কাউকে দেখে সোচ্চার উল্লাস প্রকাশ করছেন কিংবা কাউকে হয়তো অতিরিক্ত প্রশ্রয় বা লাই দিচ্ছেন, এমনকি কারও প্রতি হয়তো তাঁর পক্ষপাত প্রকাশ পাচ্ছে, তা বলে ধরে নেওয়া যাবেনা যে ওই সব মানুষ খুব উচ্চমার্গের ভক্ত। বরং হয়তো বা উল্টোটাই। এমন প্রায়ই দেখা গেছে যে, ঠাকুর যার ডাক-খোঁজ একটু বেশি বেশি করছেন সে-ই হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরকে ছেড়ে চলে গেছে। স্বার্থান্বেষীদের ঠাকুর এক লহমায় চিনতে পারতেন বটে, কিন্তু কখনও তাদের সর্বসাধারণের সামনে চিহ্নিত করতেননা।

অবশ্য অল্পবিস্তর স্বার্থান্বেষী তো আমরা সকলেই। বিনা স্বার্থে, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার জন্য আমরা ক'জনই বা তাঁর কাছে গেছি? কিন্তু তাঁর স্বরূপ ও সত্তার কিছুটা পরিচয় জানবার পর আমাদের ভিতর একটা উদ্ভাস তো ঘটবে! তখন তাঁর প্রতি ন্যুনতম ভালবাসা আর শ্রদ্ধা এবং তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম কিছুটা হলেও করার উদ্যম কি আসা উচিত নয়? তা যদি না আসে তাহলে আমরা নিকৃষ্ট ধান্দাবাজ।

আমাদের একটি বড় দোষ হল, অন্যের দোষদর্শন। ঠাকুর সত্যানুসরণে পরনিন্দা বিষয়ে তাঁর তীব্র বিরাগ ব্যক্ত করেছেন। এমন কথাও বলেছেন যে, পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া। কিন্তু পরনিন্দা এমনই এক মুখরোচক নেশার বস্তু যে, আমরা এর পাল্লায় না পড়েই পারিনা। আর এই বাকসিদ্ধ মহাজ্ঞানী শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মম বাণীটিও কিন্তু ফলিত হয়ে ওঠে। দেখতে পাই যার যে অগুণের কথা বলছি, সেই অগুণ বা দোষ আমার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। এই অমোঘ বিধানের কোনও ব্যাত্যয় হয়না।

তাই ঠাকুরের এইসব ছোটখাটো উপদেশগুলি উপেক্ষা করতে নেই। নিজের অভ্যন্তরকে মালিন্যমুক্ত রাখতে হলে সাধনার অঙ্গ হিসেবেই এইসব উপদেশকে নিজের ভিতর কার্যকর করে তোলা একান্তই দরকার। তার কারণ, আমাদের অগ্রগমণের পথে এইসব অভ্যস্ত দোষ ও সংস্কার বা অভ্যাস ক্রমে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

শোওয়া, বসা, খাওয়া ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যেও নানা বিচ্যুতি এবং ত্রুটি নিহিত থাকে। ঠাকুরের কাছাকাছি যাঁরা থাকতেন তাঁদের এসব ত্রুটি ঠাকুর নিজেই কতবার ধরিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময়ে কোনও ভক্তের অনভিপ্রেত কোনও কাজে তাকেই নিয়োজিত করেছেন, শুধু তাকে রক্ষা

করার জন্য। আমাদের কোন রন্ধ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করবে তার তো হদিশ জানা নেই। আমরা না জানলেও ঠাকুর জানেন। এইজন্যই তাঁর ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। পরিস্থিতি সবসময়ে একরকম থাকেনা, আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়। এবং তা থেকে চিরবিচ্ছেদ থেকে খুনোখুনি অবধি হয়ে যেতে পারে। খুব সামান্য কারণ থেকেই হয়তো অপ্রত্যাশিত এবং অনভিপ্রেত পরিণতি ঘটে যায়। পরে হয়তো মনে হয়, ঘটনাটা মাথা ঠান্ডা রাখলে অনায়াসে সামাল দেওয়া যেত। আমার নিজের জীবনে এরকম ঘটনা অজস্র দেখেছি। ঠাকুর আমাদের একটি স্বতঃঅনুজ্ঞা বা অটো সাজেশন দিয়েছেন। ''আমি অক্রোধী, আমি অমানী...'' ইত্যাদি। একটু তলিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যায়, প্রতিদিন পাঠ ও আবৃত্তির জন্য প্রদত্ত এই মহান মন্ত্রটির ভিতরেই আমাদের চারিত্রিক ভারসাম্য রক্ষার প্রতিষেধকটি দেওয়া আছে। ঠাকুর মানুষের চরিত্রকে কত গভীরভাবে জানতেন তা এই স্বতঃঅনুজ্ঞার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। আমার দীক্ষার প্রায় অর্ধ শতাব্দী হয়ে এল। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক বা যান্ত্রিকভাবেই হোক প্রতিদিন এই স্বতঃঅনুজ্ঞা পাঠ করে এসেছি। এবং বুঝতে পারি দীক্ষার আগের আমি এবং পরবর্তী আমির মধ্যে অনেকটা পার্থক্য রচিত হয়েছে। ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে, ধৈর্য বেড়েছে, অপমান বা গঞ্জনা সহ্য করার শক্তি এসেছে। আর পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও খুব একটা হতাশ হয়ে পড়িনা। স্বতঃঅনুজ্ঞা দিনে একবার নয়, বারবার পাঠ করা উচিত। নিজেই নিজেকে শিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তোলার এই প্রক্রিয়া তুলনারহিত।

ঠাকুরের দৃষ্টিযোগ বা 'তুক'-গুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা বা প্রতিপালন করা সহজ। আমজনতা ধর্মের দুরূহ শাস্ত্র বোঝেনা, কিন্তু তাদের গ্রহণযোগ্য ও পালনযোগ্য সহজগম্য বিধান হিসেবে দিলে তা তাদের কাজে লাগে। ঠাকুরের বাণীগ্রন্থাদি পড়লেই বোঝা যায় কত সুকঠিন বিষয়কে তিনি জল করে দিয়েছেন। সত্যানুসরণে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে মাত্র একটি স্তবকে ঠাকুর যে সহজ সংকেতটি দিয়েছেন তা এতই সহজ যে আমাদের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করে।

ঠাকুর আমাদের ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়ণী, সদাচার, যজন ও যাজন ইত্যাকার যে সব অনুশাসন দিয়েছেন সেগুলিই একজন মানুষকে সব দিক দিয়ে সার্থক করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ওইগুলি প্রতিপালন করলেই তার ক্রমোন্নতি দুর্বার হয়ে ওঠে। তবু ঠাকুর তাঁর সারা জীবনে বারংবার নানা ভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। মানুষের দক্ষতা, পারগতা, কৃতীকে আরও গতিময় করতে চেয়েছেন। ভক্তদের কাছে তাঁর প্রত্যাশার অন্ত নেই।

ঠাকুর সংঘ বা সংগঠনের নন, তিনি খণ্ড বা বিভাজনে কখনও বিরাজ করেন না, তাঁর কোনও সীমানা বা ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল নেই। এমনকী তিনি পরিবারেও আবদ্ধ নন, আত্মীয়তার পক্ষপাতও তাঁর থাকতে পারেনা। সব রকম ক্ষুদ্রতা বা সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি মুক্ত। কিন্তু আমরা তা নই। আমরা গণ্ডীবদ্ধ জীব। তার ফলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রচিত হয়েও বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়না। আমরা তাঁর বিরাটত্বে অধিগমন করতে পারিনা বলেই তাঁকে খণ্ডিত করতে চেষ্টা করি। তাঁকে সংঘে, সংগঠনে, বাঁধতে চাই। ঠাকুর এমন কথাও বলেছেন, ''আমার ঠাকুর কো'সনে, ক' ঠাকুরের আমি''। কথাটার তাৎপর্য গভীর। ''আমার ঠাকুর'' বলে ঠাকুরকে আমার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথ খুলে দেওয়া হল। তাই ''ঠাকুরের আমি'' হয়ে থাকা ভাল।

বরাবর দেখে আসছি, সাধারণ জীবনযাপন করতে করতে হঠাৎ করে ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পর ঠাকুরের দেওয়া নিত্যকৃত্যগুলিকে কঠিন বলে মনে হয়। রোজ সকালে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইষ্টভৃতি করা, নামধ্যান, শবাসন করা বা থানকুনি খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু কাজটা শুরু করে দিলে কিন্তু খুব সহজেই এইসব কৃত্য জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তবে হাঁ, নামধ্যানে অবহেলা বা শবাসন করতে ভুলে যাওয়া এসব কিন্তু খুবই ব্যাপক। সৎসঙ্গীদের অনেকেরই এই ঢিলেমি রয়েছে। আমি নিজেও এই খামতির শিকার। তবে হ্যাঁ, সংকটে সমস্যায় পড়লে নামধ্যানে যেন জোর এসে যায় এবং তৎপরতা বাড়ে। নামধ্যানে প্রথমেই অনুভূতির

জগৎ কিন্তু খোলেনা। লাগোয়া থাকলে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে জমে থাকা আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার ভেদ করে নামের কম্পন আমাদের সত্তাকে ঠিকই স্পর্শ করে।

ঠাকুর বলেছেন, কিছুদিন অভ্যাস করলে ধ্যানে বসে নাম করতে করতে একসময়ে ডান কানে নামের শব্দ শোনা যায়। তখন চুপ করে বসে ওই নাম শুনতে হয়। সোজা কথা হল বিশ্বজগতের মর্মস্থলে ওই নাম অবিরত হয়ে চলেছে। নামই সৃষ্টির মূল। তাই নাম বা বীজমন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলে অনামী পুরুষের অর্থাৎ ঠাকুরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা যায়। তখনই মানুষ নিজের জন্ম-মৃত্যুর সীমা ভেঙে অসীম হয়ে ওঠার অভিমুখে চলে। তার সঙ্গী হয় স্মৃতিবাহী চেতনা।

যাদের আধ্যাত্মিকতার পথে খুব বেশিদূর চলার বাসনা নেই, যারা ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার কথা ভাবেননা, কিংবা যারা শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে এই জীবনটাই ভালভাবে যাপন করতে চান তাদেরও পথ একটাই। ওই নামধ্যান, ওই ইষ্টমুখী চলনা, ওই ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-সদাচার-যজন ও যাজন। ওর ভিতর দিয়েই সব চরিতার্থতা লাভ করা সম্ভব। নিজের খেয়ালখুশি মতো চললে মানুষ নিজেরই পাতা ফাঁদে পড়ে কষ্ট পায়। ঠাকুর আমাদের সংসারী রেখেই সন্ন্যাসী করতে চেয়েছিলেন। আর ঠাকুরের অনুশাসন মেনে তাঁর প্রদর্শিত পথে অধিগমন করলে এই সামান্য জীবনই অসামান্য হয়ে ওঠে, এই ক্ষীণায়ু জীবনও হয়ে ওঠে অফুরান।

তবু আমরা বারবারই ঠাকুরকে বিগ্রহ বানিয়ে রেখে আমাদের ক্ষুদ্র সাংসারিক বুদ্ধি নিয়ে চলি। তাতে জীবন গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে।

নাম বা বীজমন্ত্রের স্পন্দন ছাড়া কিছুতেই ঠাকুরের সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্যই ঠাকুর নামময় হয়ে থাকতে বলেছেন। ভাববাণীতে ঠাকুরের ভারী চমৎকার একটা কথা আছে—ডঙ্কা মেরে সংসার করবি, আর ব্রহ্ম সিংহাসনে বসে থাকবি। অর্থাৎ সংসারের ভিতরে থেকেও ব্রহ্মবিহার করা যায়। উপায়ও সহজ। করলেই হয়। অন্তত ঠাকুর গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, করলেই হয়।

ঠাকুর চাইতেন তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা তাঁকেও ছাড়িয়ে উঠে যাক। তা ঠাকুরের কথাই ছিল এরকম। তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে কি করে? তিনিই সৃষ্টির শেষ কথা, তত্ত্বের চরম, সব প্রশ্নের মীমাংসা, তিনিই তো অসীমের অন্ত। তাঁর পর যে আর কিছুই নেই। তাঁর ধামে পৌঁছে গেলে "সুরত হুই অতি কর মগনানী, পুরুষ অনামী যায় সমানী।" অর্থাৎ অনামী পুরুষের সঙ্গে সুরত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, যেমন জলবিন্দু সাগরে পড়লে হয়।

এসবই অতি উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্ব। হয়তো আমাদের মতো সাধারণ মেধা ও বোধের অধিগম্য নয়। কিন্তু ঠাকুর কারও কাছেই অনধিগম্য নন। মেধাহীন, শিক্ষাহীন, অতি দীনদরিদ্র এবং এমনকী বোকা মানুষের কাছেও তিনি সহজ। আবার উচ্চ মেধা ও তাত্ত্বিকদের কাছেও তিনি পরম জ্ঞানী।

আমার বিস্ময় হত যখন দেখতাম, ঠাকুর একেবারে লঘু প্রসঙ্গ থেকে কত অনায়াসে অতি জটিল তাত্ত্বিক আলোচনায় যাতায়াত করতেন। তাঁর কাছে তো এক রকম মানুষ আসেনা। বহু ও বিচিত্রের সমাগমে তিনি সর্বদাই বেষ্টিত থাকতেন। তাও আমি তাঁকে দেখেছি মাত্র চার বছর। তখন তিনি বিশেষ কথাও বলতেননা। শরীর প্রায়ই খারাপ থাকত বলে অনেক সময়ে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা হত। আর আমি তো যেতাম মাঝে মাঝে, দু-তিন দিনের জন্য। খুব সামান্যই তাঁর পার্লারে বসার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই সামান্য একটু নৈকট্যই আজ আমার জীবনের পরম সম্পদ।

জীবনযাপন করতে গিয়ে দেখেছি, অজ্ঞানতা, আলস্য, অদূরদৃষ্টি এবং অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তিপ্রবৃত্তির প্রভাবে আমরা নানারকম সংকট ডেকে আনছি। পরিবারে, পরিবেশে, কর্মক্ষেত্রে। ফলে আমি ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেই এই সব বাধা ও বিপত্তি পার হওয়ার চেষ্টা করি। যা ঘটে সেগুলি ঠিক অলৌকিক নয়, কিন্তু নামধ্যান করলে, তাঁর স্মরণ মনন হলে আমাদের বোধ ও বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সমাধানী সংকেত পাওয়া যায়। ঠাকুর তাঁর ভক্তকে যে কতভাবে রক্ষা করেন তা বলে শেষ করা যাবে না।

অনেক আগে, শৈশবে যৌবনে জ্যোতিষী বা ভাগ্যগণনার ওপর আমার বেশ বিশ্বাস ছিল। আমার কোষ্ঠী খুব একটা ভাল নয়। তবে শুনেছি আমার শনি খুব শক্তিশালী। সে যাই হোক, একসময়ে জ্যোতিষীদের হাত দেখানো বা কোষ্ঠীবিচার করাতাম। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর ধীরে ধীরে উপলব্ধি হল যে, আমার ভাগ্যের নিয়ন্তা তো ঠাকুর। কোষ্ঠী বিচার করে কী হবে? আমাদের এক গুরুভাই এবং জ্যোতিষী দীনবন্ধু ঘোষ অনেক বলে কয়ে আমাকে একটা ক্যাটস আই ধারণ করিয়েছিলেন। কয়েক বছর আংটি করে পরেওছি। তারপর একদিন সেটি বর্জন করলাম। ঠাকুর আছেন, পাথর লাগে কিসে?

অনেকদিন আগে বিখ্যাত জ্যোতিষী দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য আমাকে আমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেই ১৯৭৩ সালের কথা। আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দেখে উনি গোপনে আমাকে বলেছিলেন যে, ওর নাকি আয়ু নেই। কোষ্ঠী খুব খারাপ। কয়েকটা পাথরের নিদানও দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আমার পয়সা ছিলনা পাথর কেনার। স্ত্রী সব শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন, শিগগির পাথর জোগাড় করো। আমি বললাম, দেখ, কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতি। আর বৃহস্পতি মানে গুরু। আমার জীবনের কেন্দ্রে ঠাকুর অবস্থান করছেন। আমি সর্বাংশে তাঁকে মেনে চলার চেষ্টা করি। তুমি ভয় পেওনা, তোমার কিছু হবেনা।

হয়ওনি। কয়েক বছর পর দ্বারেশদার সঙ্গে একবার দেখা হতেই উনি তো খুব খুশি হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরই উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, তোমার স্ত্রীর কী খবর? ভাল আছেন শুনে দ্বারেশদা খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, শীর্ষেন্দু, আমি তোমার স্ত্রীর কোষ্ঠী দেখেছি, ওর সত্যিই আয়ু নেই। তবু যে তিনি বেঁচে আছেন তাতে বুঝতে পারছি তুমি সত্যিই সদগুরু পেয়েছো। তোমার গুরু স্বয়ং ভগবান। নইলে এ জিনিস হতে পারত না। তুমি পরম ভাগ্যবান।

আমি তাবিজ, তাগা, মাদুলি বা পাথরের বিরুদ্ধে নই। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং কোনও কিছুকেই উড়িয়ে দিতেননা কখনও। পাথরের ভিতরেও যে কিছু গুণ থাকতে পারে তা তিনি বলেওছেন। কিন্তু অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর পছন্দ ছিলনা। ওই যে বলেছেন, পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তা ছাড়া একটা অদৃষ্ট কদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হয়ে বসে থেকোনা,...সৎকর্মীর কখনও অমঙ্গল হয় না, একদিন আগে আর পাছে।

ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে জ্যোতিষ বিদ্যা শিখতেও বলেছিলেন। তাছাড়া, কখনও কখনও ঠাকুর পঞ্জিকায় অশ্লেষা, মঘা, যাত্রা শুভ কিনা তারও খোঁজ নিতেন। দেবীদার দীপরক্ষী বইতে দেখেছি, স্বয়ং শ্রদ্ধেয় বড়দা ঠাকুরকে নতুন গেঞ্জী এনে দিয়েছেন আর ঠাকুর সেদিন সেটা পরবেন কিনা তার বিধান পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে জানতে পাঠাচ্ছেন। এও যেমন সত্য, তেমনি আবার অশ্লেষা মঘা অযাত্রা উপেক্ষা করে কাউকে যাওয়ার অনুমতিও দিচ্ছেন। সোজা কথা, তিনি কখন কোনটা করবেন বা মানবেন তা আমাদের সাধারণ যুক্তি বা বোধ দিয়ে বোঝা যাবেনা।

শুধু একটা কথা মনে হয়, ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে যারা চলে তাদের এসব সংস্কার না মানলেও চলে। ঠাকুর বলেছেন, পরমপুরুষের সংস্কার ছাড়া যা কিছু সবই বন্ধন। সুতরাং ঠাকুরকে গ্রহণ করার পর পূর্ববর্তী সংস্কার বা বিশ্বাস বা অভ্যাস যদি ঠাকুরের অনুশাসনের পরিপন্থী হয় তবে তা ধীরে ধীরে ত্যাগ করা উচিত, তা না হলে ঠাকুর আমাদের মধ্যে নিরঙ্কুশ অধিষ্ঠান করতে পারবেননা।

এমন প্রায়ই দেখা যায়, ঠাকুরকে আশ্রয় করার পরও আরও সব দেবদেবীরও পূজার্চনা চলেছে বা অন্য গুরুতেও আনত হচ্ছেন অনেকেই। তাতে নিষ্ঠা থাকেনা, একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অভীষ্ট থেকে যায় অধরা। বহুনৈষ্টিকের হৃদয়ে যে প্রেম থাকেনা, এ তো স্বতসিদ্ধ।

এক প্রভূত অর্থবান গুরুভ্রাতা, যিনি দুই পুরুষের সৎসঙ্গী, একবার আমাকে এসে ধরলেন তাঁর মেয়েকে দীক্ষাদানের জন্য। গিয়ে দেখি তাঁর ঠাকুরের আসনে সারিসারি নানা দেবদেবী। তাঁদেরই এক পাশে ঠাকুরের ছোট একটা ছবি কোনওক্রমে রাখা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, ঠাকুরের জন্য একটা আলাদা আসন করলে ভাল হয়।

দীক্ষাদানকালে দেখি মেয়েটি মাত্র সেই আমলের দশ পয়সা দিয়ে ইষ্টভৃতি করছে। এবং সেই ইষ্টভৃতি রাখা হয়েছে একটি থালায় যেখানে বাড়ির অন্য সকলেই ইষ্টভৃতি রাখেন।

ঠাকুরকে দশ পয়সা, কিন্তু ঋত্বিকের দক্ষিণা দুশো টাকা, সঙ্গে দুটো গরদের পাঞ্জাবির জন্য এক জোড়া কাপড়, দামী ধুতি, সংকোচে মনটা গুটিয়ে এল। ঠাকুরের গুরুত্বটাই যে এঁরা বোঝেননা সেটাই দুঃখজনক। অথচ ইনি জন্ম-সৎসঙ্গী এবং এঁর মা-বাবা খুবই ভক্তিমতী ও ভক্তিমান। এঁরা কেউ কৃপণও নন, বরং দেওয়া থোওয়ার হাত বেশ ভাল। তবু শুধু ঠাকুরের বেলাতেই কেন এত কৃপণতা সেটা বুঝে ওঠা মুশকিল।

ঠাকুরকে দেওয়া জিনিস বা অর্থ নয়ছয় হয় বা চুরি যায়, এ তো বরাবরকার ঘটনা। ঠাকুর যখন দেহে ছিলেন তখনও হত। তাঁর ভক্তজনদের মধ্যে ভক্ত সেজে থাকা ধান্দাবাজ তো কম ছিলনা। তারা, নানাভাবে ঠাকুরকে ভাঙিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করত। তা বলে আমরা কি ঠাকুরকে দেওয়ার সময় হাত গুটিয়ে রাখবো! তা কিন্তু নয়। চুরি হোক বা অপব্যয় হোক সেটা ঠাকুর বুঝবেন। আমাদের দেওয়ার ভাগ দেবো।

আবার উল্টো ঘটনাও আছে। এক ভদ্রলোক চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর প্রাপ্য প্রভিডেন্ড ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির সব টাকা নিয়ে এসে ঠাকুরকে দিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরের আপত্তি শোনেননি। ফলে তাঁর পরিবার প্রচণ্ড অর্থকষ্টে পড়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য পরিবারটি খুবই স্বচ্ছলতার মুখ দেখে। কিন্তু এরকম দানও ঠাকুর পছন্দ করতেন না। তাঁর স্পষ্ট কথা, নিজের পরিবারকে কষ্ট দিয়ে আমাকে দিওনা। ঠাকুর আরও বলেছেন, ধার করে আনা বা অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ তাঁর কাজে লাগে না।

একটা সমস্যা হল ইষ্টভৃতি নিয়ে। ঠাকুর দেহ ছাড়লে ইষ্টভৃতি কাকে দেওয়া যাবে, এই প্রশ্নের জবাবে কিন্তু ঠাকুর কোনও সংগঠনের কথা বলেননি। এমনকী তাঁর ফিলানথ্রপির কথাও নয়। বলেছেন, তার সন্তানদের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে ইষ্টগতপ্রাণ কেউ আছে কিনা। থাকলে তাকে দিতে হবে। আর যদি না থাকে তবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ওরকম কাউকে পাওয়া গেলে তাকে দিতে হবে। এইখানেই আমরা সমস্যায় পড়ে গেলাম। প্রথম কথা ইষ্টপ্রাণ কে তা বিচার করবো কোন মাপকাঠিতে, সেটা একটা সমস্যা। দ্বিতীয় কথা সকলের তো একরকম মাপকাঠি নয়। এক-একজনের বিচারে এক একজন ইষ্টপ্রাণ বলে মনে হতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ইষ্টভৃতি পাঠাবে। ঠাকুর কেন এই নিদান দিয়েছিলেন তা জানিনা। আজও এই কঠিন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে চলেছি।

ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করা, আত্মীয়তা গড়ে তোলাই আমাদের তপস্যার লক্ষ্য। কারণ তিনিই এই বিশ্ব ও জীবনরহস্যের উৎস ও সমাধান। আমরা এই সৃষ্টির অর্থই জানিনা। বিশ্বজগতের কিনারা জানিনা। হাজারটা ব্যাখ্যা আছে বটে, কোনওটাই তর্কের অতীত নয়, সন্দেহাতীত নয়। শুধু মস্তিষ্কের চালনা করে এই রহস্য সমাধিত হওয়ার নয়। একমাত্র অনুভূতির ভিতর দিয়েই সেই সমাধান আসা সম্ভব। ওই পথ যুক্তি-তর্কের পথ নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথও নয়। মন্ত্রের ধুন ও কম্পনই আমাদের অনুভূতিকে ওই উচ্চতম স্তরে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে পরম সত্যের অধিষ্ঠান। আর ঠাকুরই একমাত্র তাঁর নিয়ামক। ইষ্টভৃতির একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে 'জগতস্তং জগৎপতে'। অর্থাৎ তিনিই জগৎ এবং তিনিই জগতের অধীশ্বরও। এইটি বিশ্বাস করলে সাধনা সহজসাধ্য হয়।

ঠাকুরের সৎমন্ত্র গ্রহণ করেছি সেই ১৯৬৫ সালে। তখন বোর্ডিং হাউসে থাকি, নিতান্তই দীনদরিদ্র একটা স্কুলে অত্যন্ত অপমানজনক বেতনে মাস্টারি করি, আর কফি হাউসে আড্ডা দিই, আর লেখালেখি করি। একজন আধুনিক যুগের লেখক এক ধর্মগুরুর আশ্রয় নিয়েছে, এই ঘটনা বন্ধুমহলে বেশ সোরগোল ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, আমাকে বিস্তর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ভর্ৎসনা সহ্য করতে হত তখন। কেউ কেউ মনে করত, আমার বারোটা বেজে গেছে। আমি ঠাকুরকে আশ্রয় করে ঠিক করেছি না ভুল, তা আমি নিজেও খুব ভাল বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ঠাকুর যে আমাকে তীব্র বিষাদ এবং সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাও তো উপেক্ষা করতে পারিনা। কাজেই বিরুদ্ধতাগুলিকে উপেক্ষা করতাম। তবু দীক্ষার পরবর্তী কিছুটা

সময় বড় দোলাচলে কেটেছে। ধীরে ধীরে কিন্তু আমার পরিমণ্ডলে একটা আশ্চর্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করতে শুরু করি। লক্ষ্য করি, ঠাকুর সম্পর্কে অনেকেরই একটা সশ্রদ্ধ ভাব। আমি দীক্ষার ব্যাপারটা কখনও গোপন করার চেষ্টা করিনি এবং ঠাকুর যে আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তাও অকপটে সব জায়গায় প্রকাশ করে দিতাম। একজন প্রগতিশীল আধুনিক মানসিকতার লেখক একজন ধর্মগুরুর কাছে আশ্রয় নিয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে এটা লজ্জাজনক বলেই হয়তো অনেকে মনে করত। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করিনি। আসলে ততদিনে আমি বুঝে গেছি, আমার মেধা, বুদ্ধি বা অহং আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা। আমাকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র ঠাকুর। সেই ঠাকুরকেই যদি আমি যথাযথ গুরুত্ব না দিই তাহলে নিজের কাছেই তো আমি ছোট হয়ে যাবো।

আরও একটা অলৌকিক ব্যাপার হল, ঠাকুরের প্রতি এক গভীর টান আমি প্রায় সর্বদাই অনুভব করতাম। কিছু দিন যেতে না যেতেই মনটা অস্থির হয়ে উঠত, যাই একবার ঠাকুরের কাছ থেকে ঘুরে আসি। যতক্ষণ যেতে না পারছি ততক্ষণ কিছুই ভাল লাগত না। আমার ভিতরে ঠাকুরের প্রতি এই টান বা ভালবাসার উদ্ভব কি করে হল সেটাই এক ব্যাখ্যাতীত ব্যাপার।

ভালবাসা বা টান অনেক রকমের আছে। ঠাকুরের প্রতি আমাদের ভালবাসার অনেকটাই স্বার্থপন্থী। কারণ কোনও না কোনও ভাবে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করেছেন বলেই সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি আমাদের আসক্তি এনে দিয়েছে। আমার মনে হয় ওই ভালবাসাটুকুকেই তপস্যার মাধ্যমে বাড়িয়ে ইষ্টের প্রতি প্রেমে পর্যবসিত করে তুললেই বা তুলতে পারলেই মানুষের ইহজীবনে আর চাওয়ার কিছু থাকেনা।

আমি যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে দেওঘরে যাই, সেই ১৯৬৫ সালে তখন ঠাকুর বসতেন ''নিরালা নিবেশ'' নামক পার্লারে। এই পার্লারেরই আর একটি অংশে থাকতেন বড়মা। ঠাকুরের বেশিদিন এক জায়গায় থাকা বোধহয় পছন্দ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝেই ঘর বদলাতেন। দেওঘরে এসে প্রথম উঠেছিলেন বরাল বাংলোয়। সেটা পাকা বাড়ি। কিন্তু পাকা বাড়ি তাঁর পছন্দ ছিলনা। তাই পছন্দমতো আটচালা কুটীর নির্মাণ করিয়ে নেন। ওই ভাবেই জামতলা, নিরালা নিবেশ, খড়ের ঘর, বড় পার্লার ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছিল। কেন এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে চাইতেন না সেটা ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন কিনা তা জানিনা। তবে আমি দীক্ষা নেওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি 'নিরালা নিবেশ' ছেড়ে বড় পার্লারে চলে আসেন। তারপর আর ঠাঁইনাড়া হননি। তার সব কটা পার্লারই খুব খোলামেলা। বড় বড় স্লাইডিং দরজা ও জানালা খুলে দেওয়া হত। অবারিত আলো-হাওয়া আর অনেক দূর থেকেও ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যেত। কাঠের তৈরি এসব পার্লারের মেঝে নীচু, প্রায় মাটির লেভেলেই, চৌকাঠ নেই, বাইরে অ্যালুমিনিয়াম শীট লাগানো থাকায় ঘরগুলো গরম হতে পারত না তেমন। ঘরে ফ্যান লাগানো ছিল, কিন্তু ঠাকুর বোধহয় ফ্যানের হাওয়া তেমন পছন্দ করতেননা। তাই ঘোর গ্রীষ্মেও ফ্যান ঘুরত খুব আস্তে। ঠাকুরের চৌকি বিশাল মাপের। এত বড় চৌকি আমি আর দেখিনি। পাতলা তোশকে ঠাকুর শুতেন। ওই চৌকিই ঠাকুরের দিন রাতের আশ্রয় ছিল। ওইখানেই বসে থাকতেন এবং শুতেন। আড়ম্বর নেই বাহুল্য নেই, তবে বিছানা চাদর সব ধপধপে সাদা। ঠাকুরের ধুতি, পৈতে, ফতুয়া (শুধু শীতকালে পরতেন) সবই ঝকঝকে সাদা। পরিচ্ছন্নতা দেখার মতো। পার্লারে ঢুকলেই একটা অদ্ভুত সুন্দর সম্মোহক গন্ধ পাওয়া যেত। সেই গন্ধ খানিকটা ঠাকুরের তামাকের, খানিকটা হয়তো বা কোনও মৃদু ধূপকাঠির, আর বাকিটা বোধহয় ঠাকুরেরই দেহনিঃসৃত গন্ধ। ওই গন্ধটা আমাকে এত আকর্ষণ করত যা বলার নয়। ঠাকুর যতদিন অবস্থান করেছেন ততদিন গন্ধটা পেয়েছি। এখন আর সেই গন্ধটি নেই।

আমার সঞ্চয় সামান্য। ঠাকুরকে পেয়েছি মাত্র চার বছর। তাও তো লাগাতার নয় মাঝে মাঝে। এই সামান্য দেখা আর সামান্য কয়েকটি ঘটনাই আমার সম্বল। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, এও তো কম নয়। বিশুদা অর্থাৎ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে খেউড়ি হচ্ছেন ঠাকুর—দৃশ্যটা খুব মনে পড়ে। পিয়ারিদা পথ কেটে

দিচ্ছেন ঠাকুরের—এখনও চোখে ভাসে। প্রায় সময়েই তাঁকে শিশুর মতো দেখাত। কী সহজ আর সরল। অথচ মানুষের জটিল, কুটিল মনকে তিনি কি প্রাঞ্জলভাবে বুঝতেন।

আমার এই প্রায় অর্ধশতাব্দীর দীক্ষা-পরবর্তী জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার নিরিখে বলতে পারি, ঠাকুরের অনুশাসন অন্যের মুখে শুনলেও, নিজে পড়া এবং তা অধিগত করাই ভাল। কারণ আমাদের নিত্য করণীয় যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার সম্পর্কে এত বিভিন্ন কথা শুনেছি যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং দেয়ও। আমাদের তপস্যা, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সব কিছুই দাঁড়িয়ে আছে এই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির শক্ত ভিতের ওপর। ওখানে কোনও বিচ্যুতি বা গলদ থেকে গেলে কিছুতেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আগে সযত্নে গোড়াটি বেঁধে নিয়ে তবে জপধ্যান করলে তার ফল পাওয়া যাবে।

ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, যখনই আমাদের জীবনে নানা বিপর্যয় বা অশান্তি ঘটতে থাকে তখনই বুঝতে হবে ইষ্টভৃতিতে কোনও না কোনও ভুল বা গলদ হচ্ছে। তখনই আঁতিপাতি করে দেখতে হয়, ভুলভ্রান্তি কীভাবে হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিতে হয়।

আমি বরাবর ইষ্টভৃতি করা ও পাঠানোর বিষয়ে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার প্রবীণ ঋত্বিকদের কথায় অন্যরকম করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছি। এখনও ইষ্টভৃতি নিখুঁত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আমার নানা সময়ে সংশয় আসে। ঠাকুর মানি অর্ডারে ইষ্টভৃতি পাঠানো পছন্দ করতেন। কিন্তু এখন ই-মানি অর্ডারের যুগ, তাতে বিবরণ পাঠানো যায়না। বেশি টাকা পাঠাতে হলে মানি অর্ডারে কমিশন অত্যন্ত বেশি। পৌঁছোতেও দেরি হয়। পুরোনো মানি অর্ডারের কুপনে জায়গা কম থাকায় বিবরণ লেখার অসুবিধে হয়। বাধ্য হয়ে এক সময়ে Bank Draft-এ ইষ্টভৃতি পাঠাতাম। এখন যেহেতু Core Banking চালু হয়েছে, সেই হেতু সরাসরি আশ্রমের অ্যাকাউন্টেই টাকা জমা করে বিবরণটি রেজিস্ট্রি বা স্পিড পোস্টে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তাও সংশয় থেকেই যায়। ঠিক হচ্ছে তো!

প্রশ্ন আরও আছে। ইষ্টভৃতি ইষ্টসকাশে পাঠানোর কথাই বলেছেন ঠাকুর। তাঁর অবর্তমানে ইষ্টবাহী নিষ্ঠাবান তাঁর কোনও সন্তানকে, সন্তানদের মধ্যে ইষ্টবাহী না পাওয়া গেলে কৃষ্টিসন্তানের মধ্যে এইরকম কাউকে। সংগঠনকে পাঠানোর কথা ঠাকুরের বলা নেই। আর সংগঠনও তো একটা নয়। আসল কথা হল, ঠাকুর ইষ্টভৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের ভার আমাদের বোধ-বুদ্ধির ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে হয়তো আমাদের "সূক্ষ্ম সার্থক বিভেদ-বিচার, সফল অনুভব"-এর পরীক্ষাও লুকিয়ে আছে। আমরা ঠিক মানুষকে নির্বাচন করতে পারি কিনা সেটাও তো আমাদের পারগতার প্রমাণ।

যাই হোক, ব্যক্তিবিশেষকে ইষ্টভৃতি প্রেরণের কথা থাকলেও অনেকেই ভয়ে বা দ্বিধায় তা পাঠায়না, আশ্রমেই পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশের হিমাইতপুর সৎসঙ্গ অবশ্য একটি অভিনব কাজ করেছে। তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে তাদের শ্রীবিগ্রহ ঘোষণা করে তাঁর নামেই মানি অর্ডার পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণত প্রয়াত ব্যক্তির নামে মানি অর্ডার হয়না। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ ঘোষণা করলে তা হয়তো এদেশেও পারা যায়। বাংলাদেশে যখন হয়েছে তখন এদেশেই বা হবেনা কেন?

সৎসঙ্গের আনন্দবাজার সংলগ্ন মাঠে এক উৎসবের সময় যাত্রার আসর বসেছিল। সম্ভবত সেটা ছিল নববর্ষ উৎসব। শোনা গেল ঠাকুর যাত্রা দেখতে যাবেন। শুনেছিলাম, ঠাকুর নারী-পুরুষের মিলিত অভিনয় পছন্দ করতেননা। তাই সেটা ছিল নারীবর্জিত কোনও পালা। আসরে ঠাকুরের জন্য চৌকি পেতে বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এক ধারে দাঁড়িয়ে আমি সেই মজার দৃশ্যটি দেখেছি। ঠাকুর তামাক খেতে খেতে যাত্রা দেখছেন। আগাগোড়া দেখেছিলেন কিনা আমার মনে নেই। কারণ ঠেলাঠেলির চোটে আমি চলে আসতে বাধ্য হই। যাত্রা দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার ছিলনা, আমি গিয়েছিলাম ঠাকুরের যাত্রা দেখা দেখতে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরও যাত্রা দেখার নেশা ছিল। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছিল। ছেলেবেলায় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র খুব যাত্রা দেখতেন। কিন্তু কোনও বিষয়েই খুব একটা ঝুঁকে পড়তেননা, মাত্রাজ্ঞান ছিল সাঙ্ঘাতিক। প্রসঙ্গত

বলি, একসময়ে পাবনা সৎসঙ্গে ঠাকুর গেঞ্জি তৈরির মেশিন বসিয়েছিলেন। অনতিবিলম্বে সেই গেঞ্জির বিপুল জনপ্রিয়তা হয় এবং চাহিদা হু-হু করে বাড়তে থাকে। কিন্তু সম্ভবত সৎসঙ্গ গেঞ্জির জন্য বিখ্যাত হোক, এটা ঠাকুরের অভিপ্রেত ছিলনা। ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তেমনিই সৎসঙ্গ ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কসেরও খুব নাম-ডাক ছিল একসময়ে। বিখ্যাত সারা ব্রিজ তৈরির সাব-কন্ট্রাক্টও পেয়েছিল সৎসঙ্গ। কিন্তু ওইভাবে সৎসঙ্গকে সমৃদ্ধ করার ফন্দি ঠাকুরের ছিলনা। এসব করেছিলেন এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে। যাতে লোক উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের উদ্যোগে উপার্জনশীল হতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত রসৈষণা মন্দিরে ঠাকুরেরই নির্দেশিত ফরমুলায় যেসব ওষুধ তৈরি হয় তার চাহিদা তুঙ্গে। বিশেষ করে প্রিভেন্টিনা নামক ক্রিমটি বাণিজ্যিক হারে বাজারে ছাড়লে এটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, এর অত্যাশ্চর্য গুণের জন্য। কিন্তু এসব ওষুধ শুধু বিশেষ ভেষজের ওপরেই নির্ভর করে তৈরি নয়, তিথি নক্ষত্র মেনে তবে তৈরি করা হয়। ফলে বাণিজ্যিক হারে তৈরি করা কঠিন। কিন্তু চাহিদা এতই বেশি যে প্রতিদিন লোকে ভোররাত থেকে ওষুধ কেনার জন্য রসৈষণার সামনে লাইন দেয়।

ঠাকুর আশ্রমের কর্মকাণ্ডকে নানা শাখায় ছড়িয়ে দিয়ে প্রসারিত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাণিজ্যকরণ হতে দেননি। এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই ছিল লোকশিক্ষা। হিমাইতপুরে যখন কীর্তন যুগের অবসান ঘটিয়ে ঠাকুর সাংগঠনিক যুগের সূচনা করলেন তখন নানা প্রয়োজনে বাড়িঘর তৈরির কাজ শুরু হল। কিন্তু সে কাজেও পেশাদার মিস্ত্রিদের বরাত না দিয়ে ঠাকুর তাঁর আনাড়ি শিষ্যদের দিয়েই কাজ শুরু করিয়ে দিলেন। তারাই ইট তৈরি করত, দেয়াল গাঁথত। ঠাকুর তদারক করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। নিজের হাতে নির্মাণের যে আনন্দ তার তুলনা কোথায়? ঠাকুরের ছুতোর মিস্তিরি বা কলকব্জার মিস্তিরি যারা ছিল তারা হয়তো তেমন দক্ষ বা পটু ছিলনা। কিন্তু ঠাকুর তাদের দিয়েই কাজ করাতেন। তারা ভুলভাল করলে ভুল শুধরে নিয়ে আবার কাজে লাগাতেন, কিন্তু তাদের জায়গায় কোনও পাকা, দক্ষ মিস্তিরিকে ডেকে আনতেন না। অপারগকে পারগ করে তোলার বড় নেশা ছিল ঠাকুরের।

কোনও মানুষই ঠাকুরের কাছে ফ্যালনা ছিলনা। সবাই যাকে অপদার্থ বলে ধরে নিয়েছে ঠাকুর তার মধ্যেও পদার্থকে খুঁজে বের করতেন। মাথা-পাগলা বা নির্বোধকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেননি কখনও।

ঠাকুরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার মতলবেও অনেকে এসে জুটত। অনেক রাজনৈতিক ফেরারী আসামী বা উগ্রবাদী সেই স্বদেশী আমলে এবং পরবর্তী নকশাল আমলেও ঠাকুরের আশ্রমে এসে ভক্ত সেজে আত্মগোপন করে থেকেছে। তাদের প্রায় সবাই পরে ঠাকুরের কাছে নিজেকে উদঘাটিত করেছে। এদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। দেখেছি, তাদের মনে ঠাকুরের কী গভীর প্রভাব! আর ঠাকুরের প্রতি তাদের কী গভীর শ্রদ্ধা!

ঠাকুরের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, সামগ্রিক একটা শ্রদ্ধাবোধ। কোনও মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঠাকুর পছন্দ করতেননা। এমনকি বিরুদ্ধবাদী বা নিন্দুকদের প্রতিও তাঁর কোনও অসূয়া ছিলনা কখনও। অন্যান্য ধর্মগুরু বা মহাপুরুষদের তাচ্ছিল্য করলে ঠাকুর গভীর বেদনা বোধ করতেন। তাঁর প্রিয় কথাই ছিল "শ্রদ্ধার চাষ"। তা বলে ভালমন্দের বিচারবোধ হারিয়ে ফেলা নয়। সেটা তো আহাম্মকী। কিন্তু দোষদর্শন এবং নিন্দাচর্চার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ঠাকুর। তাঁর সামনে কেউ কারও নিন্দেমন্দ করলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হতেন। একজন প্রখ্যাত ধর্মগুরুকে একবার পুলিশ কোনও কারণে গ্রেফতার করেছিল এবং সেটি মুখরোচক খবর হিসেবে খবরের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। সেই খবরে ঠাকুর অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল, উনি তো সামান্য মানুষ নন, এত মানুষ যখন ওঁর ভক্ত তখন ওঁর নিশ্চয়ই অসামান্য গুণ ও শক্তি আছে। তাঁকে এভাবে হেনস্থা করা ঘোরতর অন্যায়।

ঠাকুর রক্ষণশীলতা পছন্দ করতেন। পুরোনো ধ্যানধ্যারণা, রীতিনীতি, সংস্কার বা বিধি চট করে উড়িয়ে দেওয়া তাঁর পছন্দ ছিলনা। গ্রহণের সময় খেতে নেই, মল মূত্র ত্যাগ করতে নেই—ইত্যাদি প্রচলিত কিছু প্রথা আছে। আজকাল বড় একটা কেউ মানেনা। বিজ্ঞানীরাও এই নিয়মের সারবত্তা স্বীকার করেননা। কিন্তু

ঠাকুর মানতেন। মানতেন তার কারণ গ্রহণের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের ওই অভ্যাসটার কিছু উপযোগিতা আছে বলেই। আবার অনেক সময়, প্রয়োজনে প্রথা প্রকরণকে পাশও কাটিয়েছেন। একইসঙ্গে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী কি করে একজন মানুষ হতে পারেন সেটাই আমাদের বিস্ময়।

আজ ১৪২১-এর পয়লা বৈশাখ। বেশ কয়েক বছর পর শরীরের কারণে এবছর নববর্ষ উৎসবে আশ্রমে যাওয়া হলনা। প্রায় প্রতি বারই নববর্ষে ঠাকুরকে প্রণাম করার জন্য আশ্রমে যাই। আজ তাই মনটা খারাপ।

আবার ভাবি, ঠাকুর কি শুধু হিমাইতপুর বা দেওঘর বা গিধনীতেই অবস্থান করেন? দীন দুনিয়ার মালিকই যদি তিনি হবেন তবে তো সারা বিশ্ব জুড়েই সর্বত্র তাঁর অধিষ্ঠান। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ'। গীতায় তিনিই তো বলেছেন একথা! তাহলে গিধনী, দেওঘর বা হিমাইতপুরেই বা যেতে হবে কেন? আসলে এটা একটা আবেগ। ভক্তজনের সমাবেশে যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলটি সৃষ্ট হয় এবং নানা প্রসঙ্গে ভক্তজনের আলাপচারিতায় বারংবার তাঁর নানা লীলা-বিভূতির বিবরণ উচ্চারিত হয় এবং সমবেত প্রার্থনার ভিতর দিয়ে যে উৎসমুখী একটা মনোগতি তৈরি হয় তাই তীর্থের মাহাত্ম্য। ঠাকুর নিজে সেখানে থাকুন বা না-থাকুন, ভক্তদের তন্মুখী আচরণের ভিতর দিয়েই তিনি প্রতিভাত হয়ে ওঠেন। ফলে দেওঘর, হিমাইতপুর বা গিধনীতে গেলে ঠাকুরের একরকম সাক্ষাৎকারও ঘটে। আমাদের জীবনে এই সাক্ষাৎকারটির মূল্য বড় কম নয়।

আমি কিন্তু ভক্তজনের সঙ্গ থেকে বিস্তর শিখেছি এবং লাভবান হয়েছি। একসময়ে তো কাঙালের মতো বয়স্ক ইষ্ঠভ্রাতাদের কাছে গিয়ে বসে ঠাকুরকে নিয়ে তাঁদের নানা স্মৃতি, ঘটনা, অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম। আর ওর ভিতর দিয়েই যেন ঠাকুরকে একটু একটু ধরতে পারতাম।

বহিরঙ্গে ঠাকুর অতিশয় সিধাসাদা মানুষ। আদুল গা, পরনে ধূতি, গলায় পৈতে। গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাচ্ছেন প্রায় অবিরল, সামান্য একটু ফাঁক দিয়েই। তাঁর তেমন সাধন-ভজন-সন্ন্যাসের কথাও শুনিনি। গৃহবাস ছাড়েননি কখনও। সন্নিসী-বৈরাগী নন। ছেলেপুলে সংসার আছে। এবং এত সহজ, সরল, এত অনাবিল তাঁর হাসি, এত সহজ কথাবার্তা যে, তাঁর ভিতরে যে মহামানবটি নিহিত রয়েছেন তাঁকে চিনতে পারে কার সাধ্যি? আমি তাঁর নির্মোকটি ভেদ করতে পারিনি বটে, কিন্তু প্রথম দর্শনেই একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, ইনি খুব সহজ মানুষ নন। সাদামাটা নন। আর তাঁর অন্তহীন শক্তিসত্তার কথা কি করে বলি? বলতে গেলে মনে হয়, ভাষার সাধ্য কত কম! আর ঠাকুর যে মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে কত পটু তা বোকা মাথাতেও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আর এই চতুরালির জালেই সেই যে ধরা পড়েছিলাম আজও অবিরল তারই খোঁয়াড়ি ভাঙছি।

ঠাকুরের সঙ্গে এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা দীর্ঘদিন ছিলেন, অবিরল তাঁর সঙ্গ করেছেন বা সেবা দিয়েছেন, তাঁর অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরাও কি বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর আসলে কে? তাঁর অনামা স্বরূপ কেমন? সেটা বোঝা অতীব কঠিন জানি। সঙ্গ, সান্নিধ্য, স্পর্শ দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে কিন্তু প্রকৃত সংযোগ ঘটেনা। তাঁর সমীপবর্তী হতে হয় নামতরঙ্গে সওয়ার হয়ে। একমাত্র নামজপ এবং তচ্চিন্তাপরায়ণতা এবং তাঁর প্রতি লৌকিক ভালবাসা হলে, স্থানগত দূরত্ব থাকলেও আশ্চর্য সংযোগ ঘটে যায়।

ঠাকুরের আশ্রয়লাভ করার পর আমার জীবনে অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটেছে। এবং তা সংখ্যায় অগুনতি। চিরকালই আমি একটা লজিক্যাল মানুষ। হাত সাফাই সম্পর্কে ধারণা মন্দ নেই। আর বাল্যকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে বিস্তর সাধু মহাত্মা সন্ন্যাসী জ্যোতিষী যোগীদের যাতায়াত। অলৌকিক কাহিনিও কম শোনা নেই। কিন্তু ঠাকুর একেবারেই তাঁদের মতো নন। প্রথমত তাঁর কথাবার্তা, যাতে কোনও ধোঁয়াশা নেই, দ্বিধা নেই, টনটনে সংসারজ্ঞান ও আঁকাড়া বাস্তবনির্ভর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ। এমনকী ঈশ্বর সম্পর্কেও তার স্পষ্ট উক্তি, ঈশ্বরে তোমার কী প্রয়োজন? তোমার প্রয়োজন তো অস্তি-বৃদ্ধি। তার ওপরেই দাঁড়াও। কী মর্মান্তিক সত্য! আর তাঁর অনুশাসন পড়ে দেখুন, ক্রমাগত মানুষকে অস্তিমুখে চালনা করার প্রয়াস। তাহলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ব্যাখ্যার অতীত ঘটনাবলী আমার জীবনে কি করে ঘটেছে? মাথা খুঁড়েও তার কারণ ধরতে

পারিনি। তবে বুঝেছি, দুর্বল, অসহায় যারা, তাঁকে আকড়ে ধরে বাঁচতে চায় যারা তাদের প্রতি তিনি অপ্রসন্ন থাকেননা। দয়া করে উতরে দেন, যেমন আমাকে বারবার দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কি কারও তুলনা চলে?

মানুষ উপদেশ বা বাণীতে শোধরায় না, কিন্তু অনুশাসন বা ভয়ে কিংবা ভক্তিতে গুরুর নির্দেশ মেনে চললে নিজের অজান্তে এবং বিনা আয়াসেই শুধরে যায়। শুধু শুধরে যায়না, আরোগ্যও লাভ করে। একটা ঘটনার কথা শুনেছি। ঘটনাটার সত্যাসত্য জানিনা। যাচাইও করা হয়ে ওঠেনি। ঠাকুরের কাছে একজন শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ থাকতেন। সারাদিন তাঁর কাজ ছিল পড়াশুনো। হঠাৎ একদিন ঠাকুর তাঁকে ডেকে একটা অদ্ভুত কাজ দিলেন। ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের নানা তথ্য সংগ্রহ করে একটা গবেষণাপত্র লিখতে হবে। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ রাজি। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় নানা গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে দুবছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি একটি বিশালকায় গবেষণাপত্র ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলেন। ঠাকুর সাগ্রহে সেটি নিলেন বটে, কিন্তু সেটি তুলে রাখা হল কোনও আলমারিতে। ওটা নিয়ে ঠাকুর কোনও উচ্চবাচ্যই আর করলেন না। বেশ কিছুদিন পর বোধহয় বিশুদা (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) বা প্রফুল্লদা (প্রফুল্লকুমার দাস) ঠাকুরকে জিগ্যেস করেন যে, এত কষ্ট করে ভদ্রলোককে দিয়ে গবেষণা করিয়ে তার গবেষণাপত্রটি তিনি ফেলে রেখেছেন কেন? ঠাকুর খুব স্পষ্ট জবাব দেননি। শুধু বলেছিলেন, পাগলামির চেয়ে তো এই কষ্টটা ভাল। ঠাকুরের এই সংকেতময় কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল, সেই ভদ্রলোকের ভিতরে পাগলামির পূর্বলক্ষণ অনুধাবন করেই ঠাকুর তাকে একটা শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত করে দেন। গবেষণাটা আসল কথা নয়, আসল ওই অন্যমন হওয়া, নিবিষ্ট হওয়া, মনপ্রাণকে কেন্দ্রায়িত করে গুরুকে খুশি করার চেষ্টা করা। আর এটা যে করে তাকে জেনেটিক অসুখও স্পর্শ করতে পারেনা। "গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি" একথাটা কিন্তু কথার কথা নয়। আজও ঠাকুরের সঙ্গ করে তা বুঝতে পারি।

আমরা কেউই ততটা মেধা বা প্রজ্ঞার অধিকারী নই যে, ঠাকুরের সম্পূর্ণ অনুশাসন বা দর্শনকে অধিগত করতে পারব। ঠাকুর সম্পূর্ণ পুরুষ, আমান পুরুষোত্তম। তাঁর সীমাহীন প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে স্পর্শ করছে।

ঠাকুরের আশ্রয়, অর্থাৎ সৎনাম যে গ্রহণ করেছে সে যদি ঠাকুরের অনুশাসনের ন্যূনতম কৃত্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তবে তার চলন বলনে, মুখশ্রীতে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য চলে আসে। অর্থাৎ প্রকৃত সৎসঙ্গী যে, সে খুব বড় সাধক বা বরেণ্য ভক্ত না হলেও তাকে ঠাকুরের মানুষ বলে খানিকটা চেনা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঠাকুর ছাড়া অন্য ব্যক্তিতে আনুগত্য হলে এটা হবেনা। ঠাকুরের বিকল্প বা প্রতিভূ কিন্তু কখনোই আমাদের ধ্যেয় নন। আমাদের প্রাণ ও অস্তিত্বের রক্ষাকর্তা এখনও ঠাকুর, তা তিনি বিদেহী হলেও। দেহ নেই বলে তিনি নেই—এ কথা মনে করা মস্ত প্রমাদ। আমাদের ধ্যান ও মননের কাঁটা সর্বদা যেন ঠাকুরমুখীই হয়।

নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে বলি, ঠাকুর যে আজও বিদ্যমান, এখনও যে তাঁর জীয়ন্ত সত্তা সর্বদাই আমাদের নাগালে রয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আমার নেই। তবে আমি বা আমরা অনেকেই সর্বদা তচ্চিন্তা পারম্পর্য রক্ষা করতে পারিনা। তখনই ঠাকুরের ঐশী সত্তার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব রচিত হয়। আবার চেপে নামধ্যান করলে এবং তন্মুখী হলে ওই দূরত্ব ঘুচে যায়। প্রকৃত ভক্ত হল সে-ই, যে সর্বদাই নামে প্রেমে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। সে হয় বিশ্বজয়ী।

দীক্ষার পর থেকেই ভক্তসঙ্গ আমার বড় প্রিয়। তার একটা কারণ হল ঠাকুর সম্পর্কে আমার অদম্য কৌতূহল। দ্বিতীয় কারণ হল ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ তেমন ছিলনা বলে তাঁর ভক্তদের সঙ্গ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। আর এই সঙ্গ করতে গিয়েই দেখেছি, ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই চরিত্রে ঠাকুরের প্রতিবিম্ব খানিকটা পাওয়া যাচ্ছে। তবে সবটা নয়। বয়স্ক, দীর্ঘদিন ঠাকুরের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করা মানুষেরও নানা ছোটখাটো কিন্তু অমার্জনীয় ত্রুটি এবং বিচ্যুতি আছে। আর তার ফলে ঠাকুরের প্রতি

তাঁদের অনুরাগ এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁদের পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবনে অনেক প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে।

একটু সতর্ক থাকলে এবং ছোটখাটো বিধিগুলিকে উপেক্ষা না করলে সহজেই এইসব বিপর্যয় এড়ানো যেত। ঠাকুরের দেওয়া বিধিগুলি তাই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

সকালে আমাদের প্রথম কাজ হল, ইষ্টভৃতি করা। ঠাকুরের কথা অনুযায়ী সূর্যোদয়ের আগেই তা করা ভাল। আর ইষ্টভৃতির মন্ত্রেই বলা আছে যে, সব কাজের আগে, জলগ্রহণ করারও পূর্বে ইষ্টভৃতি করতে হবে। কিন্তু এটুকু নিয়েই কিন্তু বিতর্ক বড় কম নেই। অনেকে "প্রাগেব সর্বকার্যেভ্যো" বলতে শয্যাত্যাগেরও আগে বোঝেন এবং ঘুম থেকে উঠে বাসি বিছানাতেই ইষ্টভৃতি করেন। ঠাকুর কিন্তু বলেন, অরুণ-ঊষার আগেই করিস রাত্রিশয্যার সকল ত্যাগ। সেই রাগেরই অনুরাগে পালিস ইষ্টভৃতির যাগ।

বাসি বিছানায় বাসি কাপড়ে ইষ্টভৃতি করলে তাতে ভক্তি বা নিষ্ঠা আসেনা, দায় সারা হয় মাত্র। যদিও অনেকে মনে করেন, মুখ ধুতে গেলে বা দন্তধাবন করলে এক আধ ফোঁটা জল হয়তো অজান্তে গেলা হয়ে যাবে। তাতে জলগ্রহণের দোষ অর্শাবে।

অর্থাৎ বিতর্কের শেষ নেই। ঠাকুর লীলাময় পুরুষ, তাই বোধহয় সব বিতর্ক নিকেশ করে দিতে চাননি। তবু যা বুঝি, সকালে উঠে কাপড় ছেড়ে শৌচাদি সমাপন করে ইষ্ঠভৃতি করাই বিধেয়। শৌচাদি আচমনের মধ্যে পড়ে। আর শুভকার্যের প্রারম্ভে আচমন অবশ্য কর্তব্য।

ঠাকুর যে স্বতঃঅনুজ্ঞা প্রচলন করে গেছেন তার তাৎপর্য নিয়েও অনেকে প্রশ্ন করেন। স্বতঃঅনুজ্ঞা শুধু পাঠ বা আবৃত্তির জন্য নয়। ওই ভাবে নিজেকে ভাবান্বিত করে তোলা, মনের ওপর দৃঢ়ভাবে ওই জীবনীয় অনুজ্ঞাগুলিকে আরোপিত করাও অস্তিবৃদ্ধির সহায়ক। ক্রোধের একটা অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ যে কত সর্বনাশ করে দিতে পারে তা নানা ঘটনায় আমরা দেখেছি। আমাদের অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তি প্রবৃত্তির নানা রকমারি প্রকাশ আছে। তাদের বশে রাখার জন্য যে মানসিক ঐশ্বর্য প্রয়োজন তাকে সক্রিয় করে তোলার জন্যই ওই স্বতঃঅনুজ্ঞা। ঠাকুরের প্রদত্ত কোনও একটি বিধিরও মূল্য কম নয়। ওই স্বতঃঅনুজ্ঞা যে কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব মানুষের জীবনে বিস্তার করতে পারে তা নিজের জীবনেই আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

যান্ত্রিকভাবে করলেও ওই স্বতঃঅনুজ্ঞা যখন থেকে সকালে ইষ্টভৃতির সময়ে আবৃত্তি করেছি তখন থেকেই কিন্তু একটু একটু করে কাণ্ডজ্ঞান জেগেছে। নানা অদূরদর্শিতার কাজ আজও যে করে ফেলিনা তা নয়, তবু আগের চেয়ে তা পরিমাণে অনেকটাই কম। ঠাকুরের স্বতঃঅনুজ্ঞা ভাল করে পড়লেই দেখা যায়, তার ভিতরে আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলমন্ত্রটিই নিহিত রয়েছে। শুধু সকালে একবার আবৃত্তি করাটাই নিয়ম নয়, বরং দিনে যখনতখন এবং যতবার খুশি ওই মন্ত্র আওড়ানো যায়। বিশেষ করে ক্রোধ যা উত্তেজিত হয়ে কিছু করতে যাওয়ার সময়, যা কোনও অন্যায় অসৎ কর্ম করতে উদ্যত হলেই ওই মন্ত্র আমাদের রাগ টেনে ধরে। ঠাকুর তাঁর নিজের বাণীর মধ্যে, সৎমন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছেন। তাঁকে পরম প্রেমে আকুল হয়ে ডাকলে তিনি কি আর স্থির থাকতে পারেন? ভক্তকে রক্ষা করাই তাঁর কাজ।

কিভাবে তিনি রক্ষা করেন? কোনও অলৌকিক কি? আমার কাছে তার ব্যাখ্যা নেই। তবে মনে হয়, বীজমন্ত্র ও গুরুভক্তি আমাদের ভিতরে যে একাগ্রতা আনে তাতে আমাদের ভিতরকার রক্ষাকবচগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। চেতনা ও বোধে প্রখরতা আসে। এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাঙ্গলিক সূত্রগুলি আমাদের কাছে ধরা দেয়। হয়তো আরও জটিল ও অজ্ঞাত কার্যকারণসূত্র আছে যেখানে আমাদের বোধবুদ্ধি পৌঁছাতে পারেনা। ঠাকুর আমাকে সেই যে অবাক ও স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন, আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও আমার সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

আসল কথা অন্যান্য মানুষকে তাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে অনেকটাই পরিমাপ করে নেওয়া যায়। চেনাজানা মানুষদের বৈশিষ্ট্য দিয়েই তাদের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। কিন্তু ঠাকুর এতটাই সহজ

সরল, এত দীন ও বিনয়াবনত, এত প্রেম-উছল একজন মানুষ যে তাঁর বৈশিষ্ট্য আমাদের অধিগম্যই নয়। সরল বলেই বোধহয় ঠাকুর এত জটিল, সহজ বলেই বোধহয় এত কঠিন।

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করি। সালটা ভুল হলেও হতে পারে। হয় ১৯৬৪, নয়তো ১৯৬৫। এই বিভ্রান্তির কারণ সেই সময়ে আমার মানসিক স্থিরতা ছিলনা। আর ঠাকুরকে গ্রহণ করার পর এত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে স্মৃতি কিছু প্রতারণা করতেই পারে। আমার কথাটা হল, সেই থেকে আজ অবধি আমার জীবনের বৃহত্তর অংশটাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে কেটেছে। তাঁর সম্পর্কে আমার প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন, তাঁর দেবত্ব নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা, নানা বিস্ময়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব মিলিয়ে বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে ঠাকুর আমাকে নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। আমার জীবনব্যাপী তাঁরই ছায়া, তাঁরই সুগভীর প্রভাব। অথচ তার আগের জীবনে তো ঠাকুর ছিলেননা! সেই জীবনটার কথা যখন ভাবি তখনও একটা চমক লাগে— ঠাকুর ছাড়া কি করে তখন চলত আমার? চলত, তবে সে এক দিশাহীন, উদ্দেশ্যহীন চলা। মনে আছে ইউনিভার্সিটি হস্টেলে, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-এ আমরা তিন সহবাসী দিনের পর দিন তাস খেলে সময় কাটিয়ে দিতাম। আমি পরীক্ষায় বসিনি, বাকি দুজনও অনুত্তীর্ণ হল। কেন তাস খেলে মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম আমরা তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। শ্যামাপ্রসাদ নামে এক বন্ধুর মেস-এ দিনের পর দিন ফ্লাশ খেলে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করেছি। কেন, তার ব্যাখ্যা নেই। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর ধীরে ধীরে তাস দাবার নেশা চলে গেল। আমেরিকার আটলান্টিক সিটির এক ক্যাসিনোয় নিয়ে গিয়েছিলেন আমার এক দাদাস্থানীয় মানুষ সুশীল দাশগুপ্ত। স্লট মেশিনের সামনে আমাকে বসিয়ে অনেক খুচরো কয়েন দিয়ে বললেন, খেল তো দেখি! খেললাম এবং প্রায় কিছুই অর্জন করতে পারলামনা, কিন্তু খেলাটা একেবারেই আকর্ষণ করলনা আমাকে। জুয়া খেলার ইচ্ছে উঠে গেছে মন থেকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কিনতাম। দীক্ষার পর মনে হল, আরে! লটারির প্রাইজ পেলেও সেই টাকায় তো বহু মানুষের দীর্ঘশ্বাস নিহিত থাকবে। ফোকটে বড়লোক হওয়া তো পুরুষকারের পক্ষে অপমান। সেই থেকে আর লটারির টিকিট কাটিনা।

মানুষকে ভাগ্যনির্ভরতা পেয়ে বসলে তার জীবনীশক্তিতে ভাঁটা পড়ে যায়। তাবিজ-কবচ-পাথর-যজ্ঞ-পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতির প্রত্যাশী হয়ে পড়ে। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর ভাগ্যনির্ভরতা বা কোষ্ঠীনির্ভরতা, গ্রহদোষ ইত্যাদির দুশ্চিন্তা অনেকটাই দূরীভূত হয়ে যায়। আমি যদি ঠাকুরের থাকি, আমার কেন্দ্রস্থলে যদি তাঁর অধিষ্ঠান ঘটাতে পারি তাহলে আর তাবিজ-কবজ-পাথর দিয়ে কি হবে? দেবদেবীর মন্দির, তীর্থক্ষেত্র বা অন্য সাধুদের কাছে দৌড়োনোও নিরর্থক। আমার দীক্ষা-পরবর্তী জীবনে যত কষ্ট ও অভাব ঘটেছে, আমি ধরে নিয়েছি তা কোনও না কোনওভাবে ঠাকুরের প্রতি আমার নিষ্ঠার বিচ্যুতি থেকেই ঘটেছে। তাই আঁতি পাঁতি অনুসন্ধান করে সেসব মেরামত করেছি, আর তৎক্ষণাৎ আমার সমস্যারও সমাধান ঘটে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বহুনৈষ্টিকতাও কিন্তু এক প্রবল বিচ্যুতি। ঠাকুরকেও ধরলাম আবার ভিতরে ভিতরে অন্য সাধুসঙ্গ এবং নানা দেবদেবীর পূজাআচ্চা চালিয়ে গেলাম, এর অর্থ ঠাকুরের ওপর পুরোটা নির্ভর করতে পারছিনা। আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস, এক ঠাকুরই আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তিনি সর্বদেবময়, স্বয়ং বৃহস্পতি।

অভিজ্ঞতা, কর্মকাণ্ড, অনুশীলন, নিজেকে ঠাকুরের মনোমতো গড়ে তোলার চেষ্টা ছাড়া ঠাকুরকে ঠিকমতো বোঝা যাবেনা।

'তপো বিধ্যায়না'তে ঠাকুর তপশ্চর্যার বিষয়েই বলেছেন। কিন্তু সেটা সহজ ও লোকায়ত। কঠিন শুধু গুরুর প্রতি, ইষ্টের প্রতি নিজেকে অনুরক্ত করে তোলা। কাজটি সহজ নয়। আর ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় টান না হলে নামধ্যান ততটা ফলপ্রসূ হয়না। যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-সদাচার এসব ওই ইষ্টপ্রেমের নানা ধাপ। মা বাপ পুত্র কন্যাকে ভালবাসা তো সোজা। এক হল, আত্মীয়তা এবং নৈকট্য ও আদানপ্রদান বা সাহচর্য। ঠাকুরের সঙ্গে তো তেমনটা হওয়ার জো নেই। এখন তো দেহেও নেই তিনি, তাই এই দূরত্বকে অতিক্রম করতে হলে

নিজেকে তন্মুখী করে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়াস থাকলে ধীরে ধীরে ঠাকুরের স্পর্শ, সঙ্গ, নৈকট্য, সাহচর্য অলভ্য থাকেনা। টের পাওয়া যায়, তিনি আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

ঠাকুরের 'সত্যানুসরণ' গ্রন্থটি আমরা অনেকেই নিত্য পাঠ করি, কখনও মন দিয়ে, কখনও দায়সারা ভাবে পড়তে হয় বলে পড়া। কিন্তু সত্যানুসরণের প্রথম কথাটি থেকে শেষ কথাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি উপদেশই জীবনধর্মে জারিত অমোঘ বীজ। প্রথমেই ঠাকুর বলেছেন, সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ঐ দুর্বলতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার, ঐ রক্তশোষনকারী অবসাদ-উৎপাদক vampire-কে। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে, তোমার ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে।

এই প্রথম বানীটিতেই আমি ঘায়েল। কারণ আমি নিজে খুব ভীতু, মুখচোরা। সাহসিকতার কাজ জীবনে খুব কমই করেছি। পরাক্রম বা বিক্রমের অভাবে অনেক অন্যায়, অবিচার, অপমান মেনে নিতে হয়েছে। স্বস্তির কথা এই যে, সত্যানুসরণেই ঠাকুর বীরের যে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলেনা। ঠাকুর বলেছেন, বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটিই বীরত্বের লক্ষণ। ঠিক বটে যে, এ গুণগুলোও আমার মধ্যে তেমন নেই। ফলে আমার সমস্যা দাঁড়াল আমি কি তাহলে ঠাকুরের ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকারী নই? যদি অধিকারী নাও হই তাহলে কি ঠাকুর তাঁর এই অপদার্থ সন্তানকে ফেলে দেবেন?

না, আমরা অনেকেই তার মনের মতো মানুষ নই ঠিকই, তাই বলে পরমপ্রেমময় কি আর আমাদের দিক থেকে তাঁর করুণাঘন চোখ প্রত্যাহার করে নিতে পারেন? সারাটা দীক্ষান্ত জীবনে আমি এক দুর্বল, ভীরু, পরাক্রমহীন মানুষ যে শুধু ঠাকুরের মুখাপেক্ষী হয়ে চলেছি। তাঁকে দিতে তো কিছুই পারিনি, কিন্তু দয়া করে তিনি আমাকে দিয়েছেন অনেক। তাঁর মনের মতো মানুষ হওয়ার যোগ্যতাই আমার নেই, কিন্তু যেটুকু সাধ্য সেটুকুই মাত্র আঁকড়ে ধরে থেকেছি।

ঠাকুরের সঙ্গে চালাকি করতে নেই। তবু কি আমরা চালাকি করতে ছাড়ি? অহংকার, প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ, কাম, লোভ ইত্যাদিতে জর্জরিত মানুষ পদে পদে ইষ্ট-বিস্মরণ হয়ে অকাজ কুকাজ করে ফেলে। সেদিন একজন বক্তৃতায় ঠাকুরের গুণগান করতে গিয়ে নিজের পরিবার পরিজনেরই প্রচ্ছন্ন গুণগান করছিল। শুনতে শুনতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মানুষটি ভাল বক্তা, ঠাকুরের সঙ্গ সাহচর্য পেয়েছেন, ঠাকুরকে নিয়েই চলেন, তবু কেন যে অহং-এর চক্কর কেটে বেরোতে পারেননি তার কারণ Attitude-এর অভাব। ঠাকুর যদি আমাদের জীবনের অভিমুখ না হয়ে ওঠেন তাহলে এরকম নানা গর্তে পড়ে যেতে হয়।

আমার নিজের কথাই বলি। মাঝে মাঝে আমার নিজেরও অহংকার আসে। হয়তো বেফাঁস সেই অহংকার কদাচিৎ প্রকাশও হয়ে পড়ে। কিন্তু তার পরেই গভীর চিন্তনে গিয়ে টের পাই, আমার যা কিছু অর্জন সবই ঠাকুরের দয়ায়। জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে, পরাজয় ও বিধ্বস্তির শেষ সীমায় পৌঁছেও ঠাকুরকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থেকেছি বলেই তিনি আমাকে বারবার উদ্ধার করেছেন। আজও করেন। আমার লেখালেখির ভিতরেও ঠাকুরেরই লীলা নিহিত রয়েছে। নইলে একজন লেখক হিসেবে আমার যেটুকু পরিচিতি তাও সম্ভবপর হয়ে উঠতনা।

নিজেকে নিয়েই আমার যত সংকট। তাই আমি নিজের কঠোর সমালোচক। প্রায়ই ঠাকুরকে বলি, তুমি আমা হেন অপদার্থকে সহ্য করো কি করে? অবশ্য তুমি বলেছো, নিজেকে হীন ভাবতে নেই। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, আমারে দেবতা ভাবে, আপনারে হীন, তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন। ঠিক কথা, তবু আত্মসমালোচনা আমার আসেই।

ঠাকুরকে ভক্তি কতটা করি তা জানি না, কিন্তু খুব ভয় পাই। তিনি এত জাগ্রত, এত সাড়াশীল, যে ভুলভাল কিছু করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। এই রে, এবার ঠিক ঠাকুরের ঠেলাটা টের পাবো। ঠাকুরের পথে চলতে গিয়ে যত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি করেছি তার প্রত্যেকটার জন্যই

গুনেগার দিতে হয়েছে। ঠাকুর তো কাউকে শাস্তি দেননা, কিন্তু গলদ কর্ম করলে তার ফল পেতে হয়। ঠাকুরের রক্ষাকবচ তখন নিষ্ক্রিয় থাকে বলে। যদি আমরা তাঁর অনুশাসন অনুপুঙ্খ মেনে চলি, কোনও কর্মফল বা গ্রহদোষ কাজ করতে পারেনা।

মানুষের মন থেকে যখন বিশ্বাস সরে যায়, তখনই অবসাদ আসে। আর অবসাদের মতো এমন শত্রু মানুষের আর কিছুই নেই। আমি নিজে বাল্যাবধি এই মনোরোগের শিকার। ঠাকুর সত্যানুসরণে বলেছেন, বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি শ্রবণ ও মননে মানুষের বিশ্বাস আসে, অবসাদ কেটে যায়। এ যে কত বড় সত্য কথা তা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমি টের পাই। প্রায় অর্ধশতাব্দী তাঁর ছায়ায় থেকেও যত দুর্বলতা, স্খলন ও বিচ্যুতির জালে পড়ে যাই। তবে ঠাকুরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকি বলে তাঁর দয়ায় নিজের বিচ্যুতিগুলি চিনতে এবং বুঝতে পারি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা বিচার করা সহজ হয়েছে তাঁর অনুশাসনটি সামনে থাকায়। ঠাকুরের অনুশাসনগুলির ভিতরেই ঠাকুর বিদ্যমান রয়েছেন। সেইজন্যই ঠাকুর তাঁর কথার অনুসরণ করতে বলেছেন।

আপাতপাঠে সত্যানুসরণকে যতটা সহজ ও সরল একটি পুস্তিকা বলে মনে হলেও এই গ্রন্থটির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আজও চলেছে। ঠাকুর এটি লিখেছিলেন কোনও এক ভক্তের অনুরোধে। বেশ কম বয়সেই। কিন্তু এই সহজ সরল গ্রন্থটির কথাগুলি শুধু বুঝতে পারলেই হবেনা, ওর গভীর তাৎপর্য আমাদের জীবনের নানা ঘটনা-অঘটনের ভিতর দিয়ে বোধগম্য হয়। "ধৈর্য ধরো, বিপদ কেটে যাবে" এই ছোট্ট কথাটা কী সাঙ্ঘাতিক তা আমার জীবনের সংকটময় সময়ে প্রবল বিপন্নতার মধ্যে বুঝতে পারলাম, ঠাকুরের ওই ছোট্ট কথাটিই আমাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিল। অনেকটা সময় ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরার ফলও পেয়েছিলাম। কিংবা ঠাকুরের ওই যে কথাটা, ক্ষমা করো, কিন্তু ক্ষতি কোরোনা, আমাদের পক্ষে মানা কঠিন। এই তো একজনকে সাহায্য করতে গিয়ে তার ব্যাঙ্ক লোনের গ্যারান্টার হয়েছিলাম, কিন্তু লোকটি যে জোচ্চর তা বুঝবার মতো বোধ ও বুদ্ধি না থাকায় ফাঁদে পড়তে হল। সে লোকটি ঠাকুরের আশ্রিত, তবে পরে বুঝলাম তার দীক্ষা নেওয়াটাও একটি ঢপ। ওই ভাবে আমার বিশ্বাস ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল মাত্র। সেই ঋণ সে শোধ দেয়নি, ব্যাঙ্ক মামলা করলে সে সেই মামলাটিও ঠিকমতো লড়েনি, উকিল লাগায়নি, ফলে ব্যাঙ্ক এক তরফা ডিক্রি পেয়ে যায় এবং আমাকে বিপুল টাকা গচ্ছা দিতে হয়। এই লোকটিকে কি করে ক্ষমা করি তা ভেবে পাইনা। তবে হ্যাঁ, ঠাকুরের কথা ভেবে তার অমঙ্গল বা ক্ষতি করারও চেষ্টা আমি করিনি। কারণ বুদ্ধির দোষ তো আমারই, ভালমানুষীর সঙ্গে চারচোখো বুদ্ধি না থাকলে আক্কেল সেলামী তো দিতেই হবে।

ঠাকুর তার স্বস্ত্যয়নী মন্ত্রে বুদ্ধিবিপর্যয়ের কথা বলেছেন। এই বুদ্ধিবিপর্যয়ের ফলে জীবনে যে আমরা কত রকম বিপদ ডেকে আনি তার সীমা সংখ্যা নেই। যখন নামধ্যান কমে যায়, ইষ্টচিন্তা হ্রাস পায়, আলস্য আসে তখনই যেন বুদ্ধির বিপর্যয় বেশি ঘটে। লক্ষ্য করেছি নামধ্যানপরায়ণ হলে, ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হলে সংকট-সমস্যায় বুদ্ধি স্থির থাকে, উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুলচুক কমই হয়। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। ঠাকুর যেন আমাদের জীবনের অঙ্ক কষে রেখেছেন, তাঁর পদ্ধতি অবলম্বন করলে অঙ্ক মিলবেই।

দীক্ষা নেওয়ার পর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল ছিল খুব বেশি। তখন ঠাকুরকে পরীক্ষা করার ঝোঁক চাপত প্রায়ই। তাঁর কোনও একটা বাণী নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে লেগে পড়তাম। এভাবে যে তাঁর কত বাণীর সত্যতা প্রতিভাত হয়েছিল তা বলার নয়। পরীক্ষা যে-কেউ আজও করতে পারে। "নাম করলে আর কিছু হোক না হোক, শরীরটা ভাল হয়ে পড়ে"—এরকমই একটা বাণী আছে ঠাকুরের। আমি একদিন ঠিক করলাম, দেখি শরীর ভাল হয় কিনা। সাত দিন ঠেসে নাম করেছিলাম, মনে আছে। তারপর যার সঙ্গেই দেখা হয় সে-ই বলে, বাঃ তোমার শরীরটা বেশ ভাল হয়েছে দেখছি! রংটাও ফর্সা। এইভাবে হাতে কলমে ঠাকুরকে নিজের ভিতরে সাবুদ করার চেষ্টা করেছি।

আর একটা কথা, ঠাকুরের বিশ্বাস কিন্তু এমনিতে আসেনা, বিশ্বাস অর্জন করতে হয়।

সত্যানুসরণে ঠাকুরের বলা আছে, "বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি শ্রবণ ও মননে" বিশ্বাস আসে এবং অবিশ্বাস কেটে যায়। মনে রাখা দরকার, একবার বিশ্বাস এলেই স্থায়ী হবে তা কিন্তু আমাদের মতো দুর্বল ভক্তদের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। বিশ্বাস ধরে রাখার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রয়াসী ও তৎপর থাকতে হয়। ঠাকুরকে ছবির ঠাকুর না ভেবে জীবন্ত সত্তা ধরে নিয়ে নাম-ধ্যান করলে এবং তাঁর প্রীতিপ্রদ ও তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলে আমাদের জীবনে পালাবদল ঘটবেই কি ঘটবে। সম্পদবৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা বা যশ অর্জন ইত্যাদি কিন্তু মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। মানুষ চায় স্বস্তি, শান্তি, উদ্বেগহীন জীবন। লাফ দিয়ে পাহাড়ে চড়া যায়না। ধীরে ধীরে, ধৈর্য রেখে, জীবন ও অস্তিত্বের ধর্ম পালন করে ও কঠোর পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই আমাদের উন্নতি আসে। আর সকলের উন্নতি তো এক রকমের নয়, নানা বৈশিষ্ট্যে মানুষের নানা রকমের বিশিষ্ট উন্নতি।

ঠাকুর তাই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মানতার কথা বলেন। ঠাকুর বলেন, ধীর হয়ে লাগোয়া থাকতে হয়। আলস্য জড়তাকে দূর করে দিতে হয় জীবন থেকে। আর নিজের কূল ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে স্মরণে রেখে নিজেকে তদনুপাতিক লক্ষ্যাভিমুখী করা দরকার। ঠাকুর যে ধর্মের কথা আমাদের শেখান তা অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির ওপর আধারিত, অস্তিত্বরক্ষা ও বৃদ্ধিতে তৎপর হওয়া। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যে ইষ্টকে স্থাপন করে নিতে হয়। জীবনে ইষ্ট বা অভিমুখ না থাকলে আমাদের কর্মকাণ্ড বিশৃংখল ও তাৎপর্যহীন এবং পরে বেসামাল হয়ে যায়।

এই যে সম্প্রতি সারদা কেলেংকারি ঘটে গেল এই ঘটনাটি নিয়ে আমি খুব ভেবেছি। সারদা গোষ্ঠীর কর্তা সুদীপ্ত মা সারদা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত বলেই প্রচার। কিন্তু তাঁর সংস্থার লাগামছাড়া, উল্কার মতো উত্থান দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। মনে হয়েছিল তাঁর রামকৃষ্ণ-সারদা প্রীতি নিতান্তই আবেগাশ্রিত নয় তো! আমার এক বয়স্ক লেখক বন্ধু সারদাগোষ্ঠীর একটি সংবাদপত্রে একটি বিভাগে চাকরি পেয়েছিল পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়সে। বেতন চমকপ্রদ। মাসে ষাট হাজার টাকা। শুনে আমার মন কু-ডাক ডেকেছিল। একজন অবসরপ্রাপ্ত লোককে এত বেতনে চাকরি দেওয়ার মানে কি? তাদের টি. ভি. চ্যানেলের একজন সাংবাদিককে ষোলো লক্ষ টাকা বেতন দেওয়া হত। যা ভারতের কোনও চ্যানেলের কোনও সাংবাদিকই পাননি, বরখা দত্তও নন। এই বাড়াবাড়িই তাঁর পতনের বার্তাবাহী ছিল। সংযত, সতর্ক পদক্ষেপ এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও বিচক্ষণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা না থাকলে এত বড় ও বহুমুখী ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। যে সব মানুষের টাকায় সারদার মূলধন গড়ে উঠেছে তাঁরা সবাই গরিব। অতি লাভের আশায় তাঁরা টাকা রেখেছিলেন। এই মানুষগুলির স্বার্থ যদি সারদা পরিচালকদের কাছে অগ্রাধিকার পেত তাহলে একই সঙ্গে গ্রহীতা ও উপভোক্তাদের উভয়পক্ষেরই এই বিপর্যয় ঘটতনা।

ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বড় কারবারি কাউকে কাউকে হঠাৎ করে বলেছেন, কারবার ছোটো করে ফেল। ঠাকুর কেন বলেন তা বিচার না করে আদেশ পালন যাঁরা করেছেন তাঁরা বেঁচে গেছেন। যাঁরা করেননি তারা ভেসে গেছেন।

ঠাকুরের প্রত্যক্ষ স্নেহছায়ায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে সকলেই ঠাকুরের যে কোনও নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করতে পেরেছেন এমন নয়। অনেক কঠিন কাজকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছেন। অনেকে নির্দেশটির যুক্তিযুক্ততা বুঝে উঠতে পারেননি বলে উদ্যোগী হননি। অনেকের ভিতর হয়তো সন্দেহের অঙ্কুর ছিল। পুরোপুরি ঠাকুরকে ভরসা করতে পারেননি। কাজেই ঠাকুর এখন প্রত্যক্ষ বা শরীরী নন বলে এমন মনে করার কারণ নেই যে তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেননা। তাঁর আদেশ বা ইচ্ছা কিন্তু এখনও পাওয়া যায়। তবে তার জন্য উৎকর্ণ থাকতে হয়, অনুভূতিশীল থাকতে হয়, নিজের বিচারবোধকে জাগ্রত করে রাখতে হয় এবং সর্বোপরি নাম ও ধ্যানে ব্যাপৃত থাকতে হয়। আর ওই অনুরাগের ভিতর দিয়েই তাঁর আদেশ বা নির্দেশ আসে।

অনুশ্রুতি (ষষ্ঠ), সাধনা পরিচ্ছেদে ছোট্ট একটি ছড়া আছে "নিষ্ঠাসহ নাম, পুরায় মনস্কাম।" ছোট্ট, অমোঘ, লক্ষ্যভেদী, মর্মভেদী দুটি বাক্য। ঠাকুর কখনও সখনও এরকম চকিত কথা নিক্ষেপ করতেন। দুই পংক্তির এই ছড়াটি সংক্ষিপ্ত হলেও ওর তাৎপর্য সামান্য নয়। বরং বিপুল। ওইটুকুর মধ্যেই বলা আছে নিষ্ঠার কথা, নামের কথা এবং মনস্কামের কথাও। এই মনস্কাম মানে কি আমার অশাসিত, লোভী, কামুক, প্রবৃত্তিপরায়ণ মন যা চাইবে তাই প্রাপ্য হয়ে যাবে? তা কিন্তু নয়, কারণ, প্রথমেই নিষ্ঠার কথা বলা আছে যে! ওই নিষ্ঠা অর্জন করতে গেলেই যে মনকে কব্জায় আনতে হয়। অনুধ্যান, ইষ্টচিন্তা, ইষ্টের প্রিয় কর্মে নিরত হওয়া—এইসব করতে করতে তবে নিষ্ঠা আসে। আর তখনই নাম বা জপে অধিকার জন্মায় আর তখনই নামের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায়। নাম বা বীজমন্ত্র জপও যে কত সুস্বাদু তা টের পাওয়া যায় নামের সম্মোহনে আবদ্ধ হলে। মনস্কামনা তো তখন সামান্য ব্যাপার। ওই স্তরে উন্নীত হলে সে মানুষের আর কিছু চাওয়ার থাকে?

কথাটা বললাম বটে, কিন্তু তা বলে ওই জায়গায় কিন্তু আমার পৌঁছানো হয়নি। ঠাকুর-ঠাকুর করলেই তা হয় না, নিজের দিকেও একটু তাকাতে হয়। আমি কতটুকু তাঁর হয়েছি? ঠাকুরের আমি হয়ে ওঠা তো মসৃণ সহজ পথ নয়। তবে হ্যাঁ, আমার বুঝসমঝ সামান্য হলেও ঠাকুরের ঐশী বিভা একটু হলেও বুঝেছি। সেটা ঠাকুর দয়া করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। ঠাকুরের চমৎকারিত্ব এখানেই। ভক্ত যত সামান্য মানুষই হোক, যদি একটু নিষ্ঠা নিয়ে চলে তাহলে তার কাছে তিনি অধরা থাকেননা। নানাভাবে তাকে অর্জনের পথে ঠেলে দেন। ভক্ত যদি নিষ্ঠা ও গতি ধরে রাখতে পারে তাহলে সে পড়েও না মরেও না। কিন্তু নিষ্ঠা ধরে থাকা সহজ কাজ নয়। নিষ্ঠাবান হতে গেলে জীবনকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করে তুলতে হয়। সদাচার, সদ্ব্যবহার, প্রবৃত্তিতে রাশ টানা এবং সর্বোপরি ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা ও টান বাড়িয়ে তোলা।

ঠাকুরকে যখন দেখতাম তখন মনে হত তাঁর চারপাশের মানুষজনের চেয়ে তিনি বড়ই আলাদা। ঠাকুরের সঙ্গে কাউকে তুলনাতেই আনতে পারিনি কখনও। তাঁর ভুবনমোহন হাসি, তাঁর মুখাবয়বের নিখাদ সারল্য, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে গভীর প্রেম ও মায়া—সবই যেন অপার্থিব। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তিনি এক সুদূর ব্যতিক্রম।

আমার মূলধন বড়ই সামান্য। আমি ঠাকুরের একেবারে শেষ বয়সে দীক্ষা নিই। চার-পাঁচ বছর তাঁর সঙ্গ পেয়েছি বটে, কিন্তু তা লাগাতার নয়। মাঝে মাঝে টাকা আর ছুটি ম্যানেজ করতে পারলে দেওঘরে যেতাম। সাহচর্য দূরস্থান, ঠাকুরের কাছাকাছি ঘেঁষারও উপায় ছিলনা। বেশিরভাগ সময়েই তাঁর দর্শন পেতাম পার্লারের বাইরে থেকে। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো এক আধবার পার্লারে ঢুকে দূরে বসে প্রাণভরে তাঁকে দেখতাম। আমার প্রাপ্তি ওইটুকুই, ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে যৎসামান্য।

কিন্তু আজ হিসেব করে মনে হয়, এটুকুও অনেকখানি। ঠাকুরকে আসলে পেতে হয় ধ্যানের ভিতর দিয়ে, প্রেমের ভিতর দিয়ে, নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। শুধু তাঁর সান্নিধ্য বা ঘনিষ্ঠতা বড় কথা নয়। সঙ্গ করার সৌভাগ্য সকলের তো হয় না।

ঠাকুর আরও একটা দিক দিয়ে মস্ত ব্যতিক্রম। তা হল দীক্ষার পদ্ধতি। গুরুই শিষ্যের কানে মন্ত্র দেন বলে আমরা জানি। ঠাকুর নিজে কিন্তু দীক্ষা বিশেষ দেননি। প্রথম দিকে দশ-বারোজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ সময়েই দীক্ষা দান করতেন মাতা মনমোহিনী। তারপর ঠাকুর অনন্ত মহারাজ ইত্যাদি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্যকে দীক্ষার অধিকার দেন। তারও পরে ঋত্বিক প্রথা চালু করেন। শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণ ঋত্বিকের মাধ্যমে দীক্ষা দানের প্রচলন করেছিলেন।

বীজমন্ত্র বা সৎনামটি যদিও আবিষ্কার করেছিলেন রামানন্দ ও কবীর, এটি আগ্রা সৎসঙ্গের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বীজমন্ত্র বা সৎনামের মন্ত্রগুপ্তি প্রয়োজন। এটি উচ্চারণ করা বা প্রকাশ্যে এটি নিয়ে গীতবাদ্য করা অনুচিত। আগ্রা সৎসঙ্গ কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা সঙ্ঘনামে, সাইন বোর্ডে, গানে-ভজনে এই সৎনামের এত বেশি প্রচার করেছেন যে এটি খানিকটা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ঠাকুর কিন্তু এই ব্যাপারটি

মোটেই পছন্দ করতেননা। বীজমন্ত্র সশব্দে উচ্চারণ বা সংগীতে ব্যবহার বা যত্রতত্র তা প্রচার বা প্রকাশ শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ। যা নিভৃত জপ ও ধ্যানের বিষয় তাকে নিয়ে ঢক্কানিনাদ করা সর্বাঙ্গীণ নিষিদ্ধ কাজ। এইজন্যই আমাদের ভজনে সৎনামের সংযুক্তি কতটা যুক্তিযুক্ত তা কে জানে।

সৎনাম বা বীজমন্ত্রটি যে অতিশয় শক্তিশালী তা অভ্যাস-ক্রিয়ার মাধ্যমেই বোঝা যায়। কিন্তু এই সৎনামের মূর্ত পুরুষকে ছাড়া নামের শক্তি বোঝা যায়না। আমার নিজের বিশ্বাস, ঠাকুরই এই নামের ফলিত ও মূর্ত রূপ। তিনি সরকারসাহেবকে গুরু বলে মানতেন। মায়ের গুরু হুজুর মহারাজের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। নিত্য তিনি এঁদের প্রণাম করতেন। তবে তাঁর অনুশাসন ছিল মূল হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত নির্ভর। তাই তাঁর অনুশাসনবাদ অনেকটাই আলাদা।

বীজমন্ত্র গুরুর মাধ্যমে না পেলে তা অর্থহীন। ধ্বন বা স্পন্দনাত্মক বীজমন্ত্রই শ্রেয়। কিন্তু সদগুরুর আশ্রয় না পেলে কার্যকর নয়। ঠাকুর নিজেই এই নামের মধ্যে নিহিত রয়েছেন বলে পুণ্যপুঁথিতে বলা আছে। মাতৃগর্ভেও তাঁর নাম হত। বহুবার বলেছেন, ওই নাম তাঁর ভিতরে সর্বদাই হয়ে চলেছে।

প্রেরিত পুরুষেরা কষ্ট পেতেই পৃথিবীতে আসেন। সুখের জীবন তাঁদের কেউ যাপন করেছেন বলে শুনিনি। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেও তাঁদের কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা থেকে রেহাই মেলেনি। ঠাকুরকেও যত দেখেছি ততই মনে হয়েছে কত বিরূপতা, বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবন যাপন করতে হয়েছে। যত তাঁর ভালবাসা ততই যেন কষ্ট। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর সাতাত্তর বছরের মতো বয়স। কিন্তু শরীর ভেঙে যাওয়ায় হাঁটাচলায় কষ্ট ছিল। মাঝেমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। শ্রীরামকৃষ্ণেরও ছিল নিত্য নানা অসুস্থতা। আর ঠাকুরের মনের উদ্বেগ অশান্তি তো লেগেই থাকত। কিন্তু তবু তাঁর সর্বদাই একটা উন্নত, উৎসমুখী, অস্তিবাচক মনোভাব। কখনও হতাশা, মৃত্যু, পরাজয়ের কথা বলতেননা। কোনও নেতিবাচক বাক্য উচ্চারণ করতেননা। সর্বদাই জীবনের আলোকিত দিকটিই নির্দেশ করতেন। এমন শক্ত ধাতের অস্তিবাদী মানুষ পৃথিবীতে বিরল।

ঠাকুরের পরিমাপ করি, তাঁর আধ্যাত্মিকতার হদিশ নিই, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করি এমন মেধা আমাদের নেই। তাঁর পরিমাপ করতে গেলে তাঁর কাছাকাছি প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। শুধু আমাদের আবিল চোখে ঠাকুরকে দেখে মনে হত তাঁর অঙ্গ এক অদ্ভুত জ্যোতি বিকীরণ করে, তাঁর শরীরের ভঙ্গিমায় গলিত অহং-এর প্রকাশ, আর তাঁর হাসিতে নবজাতকের সারল্য, চোখে হীরকের দ্যুতি। না, ঠাকুরের সঙ্গে কাউকে মেলাতে পারিনা। এমন অনন্য সাধারণ পুরুষ আমি কখনও দেখিনি।

সঙ্গ করা এক মস্ত ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়া আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। আমার দূর থেকেই যা একটু তাঁকে চোখের দেখা দেখতাম। যখন অন্য কারও সঙ্গে আলাপচারিতা করতেন, তখন ভাগ্যক্রমে কাছাকাছি যেতে পারলে সেটাই শুনতাম। তাঁর সঙ্গ করা মানে ওটুকুই। কিন্তু সঙ্গ না পেয়েও সঙ্গ করা যায়। তার পথ তিনিই দেখিয়ে রেখেছেন। তাঁর অনুশাসন পাঠ ও অনুসরণ, নাম ও ধ্যান, নিয়ত তাঁর চিন্তা, তাঁকে ভালবাসার প্রয়াস। আর আশ্চর্যের বিষয়, তিনি যেন এভাবেই অনেক বেশি ধরা দেন। অনেক কাছে আসেন। ঠাকুরের কাছাকাছি থাকলেই তো হবেনা, কাছাকাছি থেকে তাঁর সেবা ও তাঁরই ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত রাখলে তবে সঙ্গ করা সার্থক হয়। সেটা আর কজন পারেন? তাঁর ঘনিষ্ঠ ও কাছে-থাকা লোকদের ঠাকুর অনেকটাই আগলে রাখতেন, নানা কাজে নিয়োগ করতেন, কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করতেন ঠিকই এবং সেদিক দিয়ে এঁরা অশেষ ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। কিন্তু সেই সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদেরও ঠাকুর বঞ্চিত করেননি। তাই আজও ঠাকুরের চকিত স্পর্শ ও স্পন্দন কখনও কখনও পেয়ে যাই।

আমরা যারা ঠাকুরকে খুব কম দেখেছি বা আদপেই দেখিনি তাদের কাছে তাঁর যৎসামান্য উদ্ভাস, সামান্য স্পর্শ বা একটুখানি কৃপাই মহা মূল্যবান। আমার তো তাঁর সামান্য কয়েকদিনের স্মৃতিই সম্বল। বারবার ঘুরে ফিরে ওই সামান্য স্মৃতিগুলিই চারণ করি। হীরেমুক্তোর মতোই মূল্যবান ওই সঞ্চয়টুকুকেই মনে হয় জীবনের

পরম পাথেয়। যাঁরা তাঁকে অনেক দেখেছেন, অনেক কাছে পেয়েছেন, স্পর্শ বা সেবা করেছেন তাঁরা মহা ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী বটে, কিন্তু আমাদের যৎসামান্যর মূল্যেও বড় কম নয়।

ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে খুব বড় মাপের মানুষ কেউ তেমন নেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন, কিন্তু কালের নিয়মে তিনিও আধুনিক প্রজন্মের কাছে বিস্মৃতপ্রায় মানুষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতামাতার কথাও কি আর এখন কেউ মনে রেখেছে? সুতরাং বড় মাপের শিষ্যকে দিয়ে গুরুকে চেনানোর পদ্ধতিটাই ভুল। ঠাকুরকে তাই তাঁর শিষ্যকূলকে দিয়ে চেনার চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ, তিনি একেবারে তৃণমূলের মানুষ, প্রাকৃতজনদের নিয়েই তাঁর আধ্যাত্মিক চর্যা শুরু করেছিলেন। তাঁর পরিমণ্ডল ছিল অকিঞ্চন মানুষজনে ভরা। বেশির ভাগই গরিবঘরের মানুষ। লেখাপড়া জানা লোক কমই ছিল। ঠাকুর এদের নিয়েই তাঁর কীর্তন যুগের সূচনা করেন। অনুশাসনবাদ প্রচলনের আগে তিনি শুরু করেছিলেন একটা ভাবাত্মক আন্দোলন। তার মধ্যে ছিল এক প্রাণবন্ত কীর্তন, নাম-ধ্যান এবং তীব্র আবেগ। সূচনাপর্বে এ জিনিস না থাকলে আধ্যাত্মিকতা বা কর্মযজ্ঞের ভিত তৈরি হতনা। অনেকটা এরকমই করেছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্য। ঠাকুরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অবতারপুরুষদের কর্মকাণ্ডের অনেক মিল। শুধু কর্মকাণ্ড নয়, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বেও সাদৃশ্য আছে। তবু ঠাকুর আবার আলাদাও বটে। কারণ, তাঁর জীবনাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকতা জীবনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ধর্মকে এক ও অভিন্ন বলে সূচিত করেছে। যিশুখ্রিস্ট বিয়ে করেছিলেন কিনা আমরা সঠিক জানিনা। বুদ্ধ বা চৈতন্য বিয়ে করলেও সংসারত্যাগী। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে স্ত্রী হিসেবে দেখতেনই না। কিন্তু ঠাকুর সম্পূর্ণ অন্যরকম। বিবাহিত এবং সংসারী। আবার তাঁর সংসারযাপন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কারণ তাঁর সংসারে বাইরের সংসার ঢুকে পড়েছে। আর ঠাকুরও অন্দর-বাহির একাকার করে দিয়ে একযোগে সংসারী ও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছেন। এই ভারসাম্য রক্ষা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

যে দিন ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করি সেদিন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। একইসঙ্গে জটিল এবং সহজ এক মানুষ। একইসঙ্গে অমিত ঐশী শক্তি ও গলিত অহং-এর অধিকারী। দেওঘরের প্রত্যন্ত এক কোণে অবস্থান করছেন, কোনও পরিক্রমা নেই। চেষ্টাকৃত জনসংযোগ নেই, দেখনদারির কোনও প্রয়াস নেই। এমনিতেও ঠাকুরের জীবন ঘটনাবহুল নয়। হিমাইতপুরের গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর জন্ম এবং সেখানেই বাল্য কৈশোর কেটেছে। নৈহাটি আর কলকাতায় কিছুদিন ছিলেন পড়াশুনোর জন্য। তারপর ফের হিমাইতপুরে। হোমিওপ্যাথি করতেন এবং সেইটেই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র পেশা। তারপর সংসারেই শুরু হল তাঁর আশ্চর্য সন্ন্যাস। এইজন্যই ঠাকুরকে নিয়ে নাটক রচনা বা সিনেমা তৈরির প্রয়াস তেমন হয়নি। নাটক যাও হয়েছে তা মোটেই রসোত্তীর্ণ নয়।

ঠাকুরের অনেক বাণী ও অভিমত আছে যা এযুগের মানুষের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। বিয়ে, মেয়েদের চাকরি, বহুবিবাহ ইত্যাদি। আমি নিজেও প্রথমে এইসব মত তেমন পছন্দ করিনি। পরে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি, কথাগুলো তিক্ত হলেও অতিশয় যুক্তিপূর্ণ এবং অকাট্য। কিন্তু বিতর্ক ও তিক্ততা সৃষ্টি না করে এই বাণীগুলি ভবিষ্যতে পরিবর্তিত সমাজের জন্য রেখে দেওয়াই ভাল।

৪/৭/৪৮ তারিখে ঠাকুর একটি স্বপ্নের কথা বলেন। ঠাকুর বলছেন "কাল দুপুরে স্বপ্ন দেখছিলাম—একটা বড় বাড়ি, যেখানে আমবাগান প্রভৃতি আছে—দূরে বহু লোক। কে যেন সেখানে গানটান করছে। এমন সময় একজন লোক আসলো। সে এমন লোক, যে একাই ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। আমি তখন তাকে সব কথা বললাম এবং পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বললাম যাতে সে আর্য, ধর্ম ও আর্য্যকৃষ্টির গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্য যা' যা' করার করে। সে-ও তাই করলো। তার যেমন অদম্য সাহস, তেমনি আত্মপ্রত্যয়, তেমনি ভক্তি, সঙ্কল্প গ্রহণের সময় ছোট্ট কটা কথার মধ্য দিয়ে সর্বদা ফুটে উঠল। ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম —হায় রে দূরদৃষ্ট! তাই কি আমার কপালে আছে?

শৈলেনদা জিগ্যেস করলেন, লোকটির বয়স কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, ভোলানাথদার বয়সি। মুখে একটু একটু দাড়ি। আমার মতোই গায়ের রং—একটু কালটে মতো। একটা সিল্কের কোট গায়ে। দেখলে মনে হয়না যে অমন অসম্ভব মানুষ।

''আলোচনা প্রসঙ্গে''-র দ্বাদশ খণ্ডে এই অংশটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিল্লি সৎসঙ্গ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রী যতীন মহান্তি সম্প্রতি আমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। ঠাকুরের স্বপ্নের বিবরণে তিনি কিসের ইঙ্গিত পেয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে আমার অনুমান, ঠাকুরের বিবরণের সঙ্গে যাঁর মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে তিনি ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

আমরা সামান্য মানুষ। খুব বেশিদূর অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে ঠাকুরের এই স্বপ্নের মানুষটি নরেন্দ্র মোদী হলে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে তাঁর কর্মকাণ্ড এবং মনোভাবের পরিণতির জন্য। মনে রাখতে হবে ঠাকুর স্বপ্নটি যখন দেখেন ১৯৪৮ সালে, নরেন্দ্র মোদীর জন্ম হয় তারও দু-বছর পরে ১৯৫০ সালে। ঠাকুর যখন দেহত্যাগ করেন তখন নরেন্দ্র মোদীর বয়স উনিশ বছর। ঠাকুর এই উনিশ বছরের মধ্যে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট মানুষটির কথা আর কিছুই বলেননি। যিনি দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন তাঁকে যে প্রধানমন্ত্রীই হতে হবে এমনও কথা নয়। পদাধিকারী না হয়েও তো ভাবের প্লাবনে দেশকে ভাসিয়ে নেওয়া যায়।

ঠাকুর যে অত্যন্ত আশাবাদী তা আমরা জানি। তাঁর সত্তায় শুধু বাঁচা ও বৃদ্ধির কথা। হাল ছাড়া মানুষকে তিনি যে কতভাবে উজ্জীবিত করতেন তার হিসেব নেই। আশা, ভরসা, উদ্দীপনা, অস্তিবাদী চলন—এ সবই ছিল তাঁর দর্শন এবং মনন। মৃত্যুবিরোধী এক প্রবল প্রাণবান সত্তা।

আমার সত্যিকারের জীবন এবং অস্তিমুখী চলা শুরু হয় ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর থেকেই। তার আগে আমার জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন। আজ মৃত্যুর প্রেমে পড়লাম তো কাল বেঁচে থাকার কথা বললাম। পৃথিবী, পারিপার্শ্বিক ও জীবনযাপন সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও ধারণা ছিলনা। উল্টোপাল্টা দর্শন ও চিন্তা আমাকে বিকেন্দ্রিক করে রেখেছিল। ঠাকুরের প্রভাবে ধীরে ধীরে আমার জীবনে একটা শৃঙ্খলা আসতে লাগল। চিন্তায়, মননে, জীবনযাপন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণারও সৃষ্টি হল।

মানুষের আচরণ, আহারবিহার, অভ্যাস ও সংসার নিয়ে ঠাকুরের মতো এত সচেতন কাউকে দেখিনি। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষিতকে অনুশাসনের আওতায় আনা—এমনটাও বড় দেখা যায়না। অন্যত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দীক্ষার সময় কিছু লঘু উপদেশই দেওয়া হয়। কোনও কঠোর নিয়মকানুন আরোপ করা হয়না। ঠাকুর ব্যতিক্রম তো বটেই, অত্যন্ত কঠোর। কোনও আপসরফার প্রশ্ন নেই। যা বলা হচ্ছে তাই করতে হবে। আমার তো মনে হয় এই মুক্তকচ্ছ দিশাহীন প্রগতির যুগে মানুষকে অনুশাসনের নিগড় পারানো একান্তই দরকার। ঠাকুর তাই কখনও শিষ্যদের কোনও ঢিলেমির সুযোগ রাখেননি। তাদের মঙ্গলার্থে যে শৃংখলা মানতে হবে তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রথম আমারও মনে হত নিরামিষ খাওয়া, সদাচার পালন করা, বর্ণাশ্রম মানা এসবের কী এমন দরকার ছিল? কিন্তু মেনেছি বলেই আজ মনে হয় এই অনুশাসনের তাৎপর্য কত গভীর।

নিরামিষ খাওয়া নিয়েই আমার পরিবার থেকে তীব্র আপত্তি উঠেছিল। মায়ের ইচ্ছে ছিলনা যে, আমি নিরামিষাশী হয়ে যাই। কিন্তু সত্যি কথাটা কবুল করতে বাধা নেই। আমি অতিশয় আমিষভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু জোর করে আমিষ ছাড়িনি। একসময়ে ডিম ছাড়া আমার সকালের জলখাবার হতনা। মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, ট্যাংরা ইত্যাদির প্রবল ভক্ত ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দীক্ষার দুবছরের মধ্যেই আমার আমিষের প্রতি বীতরাগ জন্মাতে লাগল। এমনকি আমিষ-বিরোধী নানা স্বপ্নও দেখতে লাগলাম। তারপর আর সত্যিই মাছ মাংস খেতে ভাল লাগতনা। মেসে থাকতাম বলে প্রথম প্রথম জোর করে খেতাম, তারপর মেসের ঠাকুরকে বলে দিলাম আমার জন্য ডাল আর আলুভাজা করে দিতে। তাই খেয়েই দিব্যি কাটিয়ে দিতাম। মাছ মাংস ডিমের প্রতি আমার এই অনাগ্রহে আমিই অবাক। কিন্তু ওইভাবেই মাছ মাংস আমাকে ছেড়ে গেল, আমি তাদের ছাড়িনি।

পরে ভাবতে ভাবতে মনে হল, ঠাকুরের প্রতি একটু টান হলে তাঁর পছন্দের ব্যাপারগুলো শিষ্যের মধ্যে আপসে সঞ্চারিত হয়। শুনেছি, অনেক সময়ে চেহারাতেও ঠাকুরের ছাপ চলে আসে। যেমনটা কেষ্টদা এবং শরৎ হালদার এবং আরও কারও কারও হয়েছিল। আমি এঁদের ধারেকাছেও নই বটে, কিন্তু আমিযে বীতরাগ সৃষ্টির মূলে যে ঠাকুরের প্রতি আমার টানটুকুই প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। ওই সময়ে অর্থাৎ ছেষট্টি-সাতষট্টি সালে পূর্ণ দাস রোডের মেসে থাকাকালীন আমি খুব নামধ্যান করেছি, ইষ্টচিন্তাও খুব হত। কিছু অদ্ভুত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাও হয়। তখন প্রবল দারিদ্র, মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবনের পটপরিবর্তনের একটা পর্যায় চলছে। ওই প্রবল সংকটের মধ্যে বাতিঘরের মতো মনের আকাশে ঠাকুরই জাগ্রত হয়ে থাকতেন, আর সেইজন্যই সমূহ সংকটেও ভেঙে পড়িনি। মনের গভীরে একটা বিশ্বাস ছিল, ঠাকুরকে যখন ধরে আছি তখন তিনি টেনে নিয়ে যাবেনই। মুশকিল হয়, ঠাকুরকে আদ্যন্ত অনুসরণ তো আমরা করতে পারিনা। নিজেদের প্রবৃত্তিতাড়িত নানা ভুলভ্রান্তি করে ফেলি। বিশেষ করে ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী নিয়ে সামান্যতম ত্রুটি থাকলেও তাঁর দয়ার পথটি অবারিত থাকেনা। ওখানে আপস করতে নেই।

ঠাকুরের নির্দেশিত ধ্যান-পদ্ধতি নিয়েও আমার নানা অভিজ্ঞতা আছে। প্রশ্ন অনেক। চক্রফটোসহ ধ্যান সর্বত্র এবং সবসময়ে করা সম্ভব নয়, তবে চক্রফটো ধ্যানের সহায়ক বটে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত আমার তাই ধারণা। মুখ, মাথা, পা ঢেকে ধ্যান করা ভাল বলে শুনেছি। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাথা গা ঢাকা দিলে শারীরিক কষ্টে ধ্যান ঠিকমতো হতে চায়না। আজ ঠাকুরকে কাছে পেলে এসব প্রশ্নের মীমাংসা জেনে নিতাম। তারপর ধ্যান নিয়েও তো কত প্রশ্ন। ইষ্টমূর্তি ধ্যান না করে ইষ্টের গুণাবলীর ধ্যান করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অনিবার্যভাবে ইষ্টমূর্তি ধ্যানে আসেনই। সুতরাং আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই। তাই আমি ধ্যানের সময়ে নামের ওপরেই বেশি নির্ভর করি। নাম বা সৎমন্ত্রই কিন্তু সব বিভ্রান্তিতে আমাদের পথ দেখায়। নাম ধরা থাকলে তার কম্পনই আমাদের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য ঠাকুর বলতেন, নিষ্ঠাসহ নাম, পুরায় মনস্কাম।

ধ্যান মানে ঠাকুরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার প্রয়াস। ধ্যান মানেই ঠাকুরের সাহচর্য। ধ্যান মানেই নিজেকে সুকেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা। ঠাকুরকে খুঁটি করে নিজেকে তাতে বেঁধে ফেলতে পারলে জীবনযাপনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দিশা ঠিক থাকে। নাম-ধ্যানে আমাদের আলস্য আছেই। কারণ ধ্যান তো কোনও প্রমোদের উপকরণ নয়। বরং বেশ কঠিন একটি প্রয়াস। যা করতে গেলে নিজেকে বেশ খানিকটা প্ররোচিত করতে হয়। কিন্তু জোর করেও যদি নিয়মিত ধ্যানে বসা যায় তবে তা অমৃত প্রসব করে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, স্বার্থসিদ্ধির ধান্দাতেই মাঝে মাঝে ধ্যানে নিয়োজিত থেকে দেখেছি, রূদ্ধদ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে। ঠাকুর যে আমাদের সঙ্গে কত মজাই করেন। চূড়ান্ত হতাশায়, অবসাদে ভেঙে পড়তে পড়তেও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকলে কীভাবে যে তিনি উত্তরণ ঘটিয়ে দেন তা তিনিই জানেন।

ঠাকুর আমার কাছে আজও এক চরম বিস্ময়। ঠাকুরই আমার ভগবান আর সেটা ভাবাত্মক কথা নয়। রূঢ় বাস্তবের নানা সংঘাতে, সংকটে, জীবনসংগ্রামে আমি শুধু তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। তিনিই দয়া করে ধরে থাকেন আমাকে। মুখ্যুসুখ্যু সাধারণ প্রাকৃত মানুষের ভক্তি খুব সহজ সরল। তাদের মনে অবিশ্বাসের দ্বিধা থাকে কমই। যত গণ্ডগোল শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং নগরবাসীদের নিয়ে। তাদের মনই এমন বিতর্কমুখী যে সহজ বিশ্বাস আসতেই চায়না। দুঃখের বিষয় আমিও এই বুদ্ধিজীবী নাগরিকদের দলেই পড়ি। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে আমার। কিন্তু এও ঠিক যে, ঠাকুর স্বয়ং কিন্তু আদ্যপান্ত এক যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর আলাপ আলোচনায় যুক্তির যে ধার ও অকাট্যতা তা আমাকে বহুবার বিস্ময়াবিষ্ট করেছে।

বিশ্বাসের সপক্ষে ঠাকুরের যা বলা আছে তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঠাকুর ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তি নির্দেশ করেন একেবারে প্রাথমিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। যাতে এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনড় থাকে তার জন্যই তিনি ইষ্টভৃতির সঙ্গে পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতিও করতে বলেন। তাতে মা বাবার প্রতি ভক্তি

গভীর হয়। আর ওই ভক্তিই গুরুভক্তির ভিত্তি রচনা করে দেয়। বড় ইমারত তৈরি করতে হলে দৃঢ় ভিতের দরকার। সেই ভিত ওই পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির অভ্যন্তরেই অঙ্কুর মেলে দেয়।

প্রেরিত পুরুষেরা একেরই বার্তাবাহী বটে। কিন্তু তাঁদের রকম আলাদা। আবার আলাদা হয়েও মূলে এক। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রও সেই একেরই পুনরাবির্ভাব। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য বেশ পৃথক। এই পৃথকত্বকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবো তা জানিনা। শুধু বলা যায় তাঁর ধী ও প্রজ্ঞা যেন আরও ব্যাপ্ত। কেননা ঠাকুরের আবির্ভাব এক জটিলতার যুগে। শুধু ভাবাত্মক লীলা এযুগে তেমন কার্যকর হবে না বলেই বোধহয় এই সর্বজ্ঞ মানুষটি শুধু ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তা কীভাবে অর্জন করতে হবে তার পন্থাটিও অমোঘভাবে নির্দেশিত করেছেন। ঠাকুরের ইষ্টভৃতি এক অভিনব ও বিতর্কিত ব্যাপার। শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ইষ্টভৃতিকে শুধু আবশ্যিকই করলেন না, তা কঠোর নিয়মে বেঁধেও দিলেন। প্রথম দিকে প্রচলিত ছিলনা বলে ঠাকুরের পুরোনো শিষ্যরা আপত্তি তুলেছিলেন বটে, কিন্তু ঠাকুর অনড় থেকেছেন। যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি নিখুঁতভাবে পালন করলেই একমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাস অর্জনের পথ খুলে যায়। বিচ্যুতি ঘটলে ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কপাট বন্ধ হয়ে যায়।

ঠাকুরের মতো এমন হাতে-কলমে অনুশীলনের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণ শেখানো অন্যত্র লক্ষ্য করা যায়না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছু কঠোর তপশ্চর্যা আছে বটে, কিন্তু গৃহী শিষ্যদের এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করাটা অভিনব। শুধু তাই নয়, যে-ই দীক্ষা নিক সঙ্গে সঙ্গে তার ভালমন্দের দায়ও ঠাকুর নিতেন। ঠাকুরের পাঞ্জাধারী ঋত্বিকরাই মন্ত্রপ্রদান করেন বটে, কিন্তু দায়ভাগ নিতেন ঠাকুর।

আমাদের এক নিষ্ঠাবান গুরুভাইয়ের একটি জড়বুদ্ধি ছেলে ছিল। তিনি অনেক দিনের দীক্ষিত। ছেলে হওয়ার আগে থেকেই। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি ছেলেটি সম্পর্কে ঠাকুরকে কিছু বলেছিলেন কিনা। প্রশ্ন শুনে দাদাটি অনেকক্ষণ করুণ মুখে চুপ করে ছিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, করেছি। কিন্তু ঠাকুর যা বলেছিলেন তা আমি করে উঠতে পারিনি। আমি সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, ঠাকুর কি বলেছিলেন? উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠাকুর বলেছিলেন শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে একটু মাটি এনে খাইয়ে দিতে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে খাওয়াননি কেন? আপনি যেখানে থাকেন সেখানে তো অনেক শুয়োরের খোঁয়াড়। উনি চুপ করে রইলেন। আমিও আর জবাবের জন্য চাপাচাপি করলাম না। বুঝলাম, ঠাকুরের এই টোটকা উনি ছেলেকে খাওয়াতে সাহস পাননি। বেশ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোথাও একটু অবিশ্বাস নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। নইলে নির্দ্বিধায় ঠাকুরের নির্দেশ পালন করতেন এবং ছেলেও আরোগ্য লাভ করত। বিষে যে বিষক্ষয় হয় তা তো আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত এবং গৃহীত প্রক্রিয়া।

তবে এরকম বিশ্বাসের দোলাচল বা দুর্বলতা আমাদের সকলেরই কমবেশি আছে। যদি না থাকত তাহলে, তাহলে ঠাকুর তাঁর পার্থিব লীলাকালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। ঠাকুর স্বামীজি বা অভেদানন্দের মতো শিষ্য বা নাগমশাইয়ের মতো ভক্ত পাননি ঠিকই, তবু সাধারণ মানুষকে দিয়েই যা ঘটিয়েছেন তারও বা তুলনা কই? আমি কিন্তু সৎসঙ্গের কথা বলছি না। সঙ্ঘ সংগঠন করতে তো ঠাকুর আসেননি, মানুষের ভিতরটাকে জাগ্রত করতে এসেছিলেন। আমার মনে হয়, ঠাকুরের অসামান্য অনুশাসন বুঝতে মানুষের সময় লাগবে, তাই তাঁর প্রতিষ্ঠা হবে ধীরে ধীরে, কিন্তু অমোঘভাবে।

প্রেরিত পুরুষেরা আসেন। মানুষকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করেন। মানুষের জীবনীর উপাদানগুলি নির্দেশ করেন, আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রেম ও ভালবাসার কথা বলেন, ক্ষমার কথা বলেন। এসবই তো আমরা প্রায় আবহমানকাল থেকে জেনে আসছি। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, যীশু, হজরত রসুল, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণদেব সকলের পদ্ধতি একই রকমের। পরিস্থিতি পরিবেশ বিচারে সামান্য সময়োচিত পার্থক্য ঘটে মাত্র। ঠাকুর প্রেরিত পুরুষদের সর্বাধুনিক আবির্ভাব। তাঁর কথাও প্রায় একই, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা মর্মভেদী, কালপ্রাচীন প্রথাগুলিকে মানুষ অন্ধের মতো অনুকরণ করে, এটা ঠাকুর কখনও চাননি।

একবার ঠাকুরকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, যজ্ঞে ঘি পোড়ানোর তাৎপর্য কী? ঠাকুর জবাবে বললেন, উৎসবাদিতে এক জায়গায় বহু মানুষ জড়ো হলে তাদের শ্বাসে, প্রশ্বাসে এবং বর্জ্যে পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে। ঘি পোড়ালে তার ধোঁয়ায় বাতাস ionised হয়ে যায়। অর্থাৎ যজ্ঞধূম পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে। যজ্ঞের এই তাৎপর্য আমার তো জানাই ছিল না। জেনে যেমন অবাক হয়েছি, তেমনি খুশি। চিরাচরিত প্রথাগুলিকে আমরা অন্ধের মতো পালন করে যাই, কিন্তু তার তাৎপর্য তেমন জানিনা। এটা দুঃখের বিষয়, জানা থাকলে তা পালন করতে অন্যরকম একটা স্পৃহা আসে।

ঠাকুর এরকম কত ছোটোখাটো জিনিস যে আমাদের শিখিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যেমন ''কৃপা'' শব্দের অর্থ ''করে পাওয়া।'' কৃ অর্থে করা, পা অর্থে পাওয়া। অহৈতুকী দয়া নয়। ''চরণপূজা'' শব্দের আসল অর্থ হল ''চলনপূজা'' অর্থাৎ তাঁর চলনকে অনুসরণ করা। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, তাঁর নির্দেশমতো চলা।

এ যেন ঠাকুর আমাদের নতুন করে তাঁর পাঠশালায় পাঠ দিয়েছেন। আবছা ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে চলাই নিরাপদ। ঠাকুর তাই বলেন, জ্ঞান ধাঁধাকে ধ্বংস করে মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে।

বিশাল জ্ঞানী হওয়া তো সোজা নয়। কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া দরকার। আবছা ধারণা নিয়ে চলা বিপজ্জনক। ঠাকুর আমাদের ধীমান, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও সজাগ মানুষ করতে চেয়েছেন। আর তাই নাম ও ধ্যান, সদাচার, যজন-যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, এগুলিই আমাদের চৈতন্যকে জাগ্রত রাখে তৎপর করে তোলে, ভ্রম সংশোধনের পথে নিয়ে যায়। ঠাকুরের দেওয়া এই অনুশাসনই আমাদের রক্ষাকবচ। সকলেই যে আমরা বড় বড় মানুষ হয়ে উঠবো তা নয়। তবে আমাদের বৃদ্ধির পথ সমস্তই খুলে যাবে। ঠাকুরকে অনুসরণ করতে গেলে নিজের পুরোনো অভ্যাস, সংস্কার, বিশ্বাস এবং ধারণাকে বদলাতে হয়। সেই প্রয়াস কিছুটা কার্যকর। কিন্তু ঠাকুরের ওই কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য ঃ পরমপুরুষের সংস্কার ছাড়া যা কিছু সবই বন্ধন। ঠাকুর যে আমাদের সব সংস্কারই বিসর্জন দিতে বলেন তাও নয়। যেগুলি তাঁর অনুশাসনের অনুকূল তা থাকতেই পারে। এমনকি আগে দীক্ষা নেওয়া থাকলে তাও ত্যাগ করতে কঠোর নিষেধ আছে ঠাকুরের। মুসলমান শিষ্যদের তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া এবং রোজা রাখতে বলেছেন। খ্রিস্টানরাও তাদের কৃত্য সবই করবে।

সব ধর্মই এক—এটা একটি প্রচলিত উক্তি। কিন্তু ধর্ম নিয়ে যে বিস্তর সংঘাত এবং দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিদ্বেষ তার মূলে একত্ববোধ নেই। আছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ—এই অহংবোধ। ঠাকুর আসলে ধর্মের পৃথকত্ব মানতেননা। বলেছেন, মানুষের ধর্ম একটাই, আর তা হল অস্তি-বৃদ্ধির ধর্ম। সব ধর্মমতই ওই একই কথা বলে। তবে যেটা পৃথক বলে মনে হয় তা হল মত। সুতরাং হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ধর্মাদি আসলে পৃথক ধর্ম নয়, ওগুলি মত। দেশ কাল পাত্র পরিস্থিতি প্রয়োজন অনুসারে যত পৃথক হতেই পারে, কিন্তু ধর্ম একটাই। যে ধর্ম মানুষকে বাঁচতে ও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে তাই মানুষের ধর্ম। আল্লা, গড, ব্রহ্ম কারোই তো আকার নেই। স্ত্রী বা পুরুষও নন তাঁরা। গুণাতীত, ধারণাতীত, অবাঙমনসগোচর, তাহলে তাঁকে কোন ধর্ম দিয়ে বাঁধি? তিনি তো কোনও বন্ধনেই বন্ধনযোগ্য নন!

ঠাকুর ''হিন্দুধর্ম'' কথাটার চেয়ে ''আর্যধর্ম'' কথাটা বেশি পছন্দ করতেন। হিন্দু কথার মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। আর্য কথাটায় তা নেই। আর্যর ব্যাপ্তিও অনেক বেশি। ঠাকুর যেমন শুদ্ধাচারী ও সদাচারী ছিলেন এবং আমাদেরও তাই শিখিয়েছেন, তেমনি আবার তিনি পরম উদার ও সহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁর সব সম্প্রদায়ের শিষ্যদের বৈশিষ্ট্য তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। ঋত্বিকের পাঞ্জা যাঁরা পেতেন তাঁদের সম্পর্কে ঠাকুরের একটা কথা ছিল, All my ritwiks are Brahmins. তাঁর খ্রিস্টান বা মুসলমান বা আদিবাসী যে কোনও সাধকের কাছেও যে কোনও বিপ্র সন্তান দীক্ষা নিতে পারেন এবং নিয়েছেনও। ঠাকুরের আনন্দবাজারে পংক্তিভোজনে ভদ্রেতর ভেদাভেদ ছিল না, এখনও নেই। ঠাকুরের শিষ্যরা এদেশ ও

বাংলাদেশ মিলিয়ে যে ছয়-সাতটি সংগঠন চালান তার সর্বত্রই একই নিয়মে আনন্দবাজার বা ফ্রি কিচেন পরিচালিত হয়। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সব একাকার। কিন্তু আবার অন্ন রন্ধন এবং পরিবেশন করেন বিপ্ররা। এই নিয়মের ব্যাত্যয় নেই।

সুশীলদার সঙ্গে আলাপচারিতায় ঠাকুর বলেছিলেন, চতুর্বর্ণের সকলেরই যদি দশবিধ সংস্কার হয়ে থাকে তাহলে পরস্পরের মধ্যে অন্নজলাদি চলতে পারে।

বলাই বাহুল্য ঠাকুরের অনুশাসন এ যুগের মানুষের পক্ষে বেশ কঠোর মনে হবে। তবে আমার মনে হয় এই কঠোরতার প্রয়োজন আছে। আর ভাতের হাঁড়ি নিয়ে চিন্তায় মজে থাকলেও ধর্ম হবেনা কিন্তু, সদাচার বা আহারশুদ্ধিই সবটুকু নয়। শুধু আহারশুদ্ধিই ধর্মের সোপান—এমনটা মনে করা এক মস্ত ভুল। এইসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অনেকেই নিজেকে হাস্যস্পদ করে তোলেন। ঠাকুর তিন রকম সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক। আহার বিহার শারীরিক সদাচারের একটি অংশ মাত্র। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল আধ্যাত্মিক ও মানসিক সদাচার। এই দুই সদাচারে অভ্যস্ত না হলে ঠাকুরের সহচর হওয়া কঠিন। আধ্যাত্মিক সদাচারের নামধ্যান যেমন আছে তেমনি গুরুমুখী একনিষ্ঠতারও প্রয়োজন। ওই একনিষ্ঠার যদি ভাগীদার জুটে যায় তাহলে গুরুর সঙ্গে দ্বিচারিতা হবে। গুরুর জায়গায় কোনও বিকল্প বসাতে নেই। মানসিক সদাচার হল নিজের বৃত্তি প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। সে কাজও বড় সহজ নয়। লাগাতার চেষ্টার ভিতর দিয়ে তা অধিগত করতে হয়। ঠাকুর আমাদের তাঁর নিরাপত্তার বলয় দিয়ে ঘিরে রাখতে চান। তাই তাঁর ওই শত অনুশাসন।

যাঁরা দীক্ষা নেন, তা যে কোনও গুরুর কাছেই হোক, তাঁরা দীক্ষাটাকে একটা রক্ষাকবচ বলে মনে করেন এবং তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননা বা তেমন সক্রিয় হয়ে আত্মসংশোধনে ব্রতী হননা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গুরুর দিক থেকে তেমন কোনও বাধ্যবাধকতাও থাকেনা। ফলে দীক্ষার পরেও মানুষ যে কে সেই থেকে যান। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যেও তেমনই গয়ংগচ্ছ ভাবই বেশি দেখা যায়। কিন্তু যে শিষ্য আড়ে হাতে লেগে ঠাকুরকে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেন তাঁর কিন্তু জীবনের ধারাই পাল্টে যায়। আর ঠাকুরের অনন্যতা হল তাঁর কঠোর অনুশাসন। দীক্ষান্তে করণীয় যা তার সবকিছুই করতে হবে। অবহেলা-আলস্য-শ্লথতার কোনও স্থান নেই। অর্থাৎ ঠাকুর দীক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত নন, দীক্ষান্তে শিষ্যদের জীবনচর্যার নিয়ন্ত্রণও হাতে নেন, যাতে সে বিনষ্ট না হয়। ঠিক এই মনোভাব ঠাকুরের বরাবরের। যখন ডাক্তারি করতেন তখন রোগী ডাকুক বা না-ডাকুক নানা ছলছুতোয় গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে আসতেন। বা চুপিচুপি খবর নিতেন।

আমার এক আত্মীয়কে বছর কয়েক যাজন করেও দীক্ষা নেওয়াতে পারিনি। তাঁর ভয় ছিল নিরামিষ নিয়ে। পরে আমার যাজন এড়ানোর জন্য তিনি অন্যত্র দীক্ষা নিয়ে নেন। সেখানে আমিষে নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। আর আশ্চর্য এই যে, দীক্ষার অনতিকাল পরেই তাঁর ক্যানসার হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ক্যানসারের কথা তাঁর আশ্রমে জানাতে। তিনি জানিয়েছিলেন এবং আশ্রম থেকে একটা দায়সারা জবাব পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমাদের ঠাকুর কিন্তু কখনও কোনও শিষ্যের সংকটে বিপদে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করতেননা। কিসে তাঁর ভাল হবে সে-ই পন্থাই ভাবতেন এবং নির্দেশ দিতেন। মৃত্যু ব্যাপারটা ঠাকুরের অপছন্দ ছিল। তাঁর সমস্ত অনুশাসনই তাই মৃত্যু বিরোধী এবং জীবনমুখী। তাই প্রার্থনার মন্ত্রে আছে মৃত্যু, যিনি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন, আমি যেন তাঁহা হইতেও অমৃত বহন করিতে পারি।

আমরা, অর্থাৎ আমি আর কল্যাণ চক্রবর্তী একবার ঠিক করলাম, ঠাকুরের কোনও বিবেকানন্দ আছেন কিনা তা খুঁজে দেখবো। কারণ, ঠাকুরের আশেপাশে বা কাছাকাছি বা তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে খুঁজেও কাউকে পাওয়া যায়নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দীক্ষা নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরিণত বয়সে, এবং এখন তিনি অতীত। নেতাজীর বাবা-মাও অতীত। তেজোদীপ্ত, উর্জ্জী তেমন ব্যক্তিত্ব কাউকে না পেয়ে একদিন সন্ধেবেলা দেওঘরের বড়াল বাংলোর একটা কোণের ঘরে সুশীল বসুর কাছে হানা দিই। তিনি তখন কারও সঙ্গে বিশেষ

দেখাসাক্ষাৎ করতেননা। ঠাকুরের পার্লারেও তাঁকে দেখা যেতনা। ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। একজন অনুচর আমাদের পথ আটকাল, বলল, দেখা হবেনা। আমরা কিছু বাকবিতণ্ডা শুরু করায় ভিতর থেকে সুশীলদাই তাঁর অনুচরকে বললেন আমাদের ঢুকতে দিতে। গেলাম। সুশীলদার তখন বেশ বয়স হয়েছে। শান্ত মানুষ। আমরা বিবেকানন্দের কথা বলায় তিনি সামান্য অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বিবেকানন্দ শিকাগোয় বক্তৃতা দিয়ে নাম করেছিলেন বলেই তোমরা তাঁর কথা বলছ। এমন তো হতে পারে যে, ঠাকুরের এমন অনেক বিবেকানন্দ আছেন, লোকে যাঁদের কথা শোনেনি!

আমি সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একমত। এরকম তো হতেই পারে, তাহলে আপনি দয়া করে এরকম একজন বিবেকানন্দের ঠিকানা দিন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

এ কথায় উনি হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, শোনো ঠাকুরের কোনও বিবেকানন্দ নেই এবং তাঁর দরকারও হয়নি। উনি একাই সব কিছু করেছেন।

দীর্ঘদিন সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত আছি বলে খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকের অনেক অবদান আছে বটে, কিন্তু সবটারই মূল হলেন ঠাকুর এবং একমাত্র ঠাকুর। আর সংগঠন করার জন্য তো তাঁর আবির্ভাব নয়। সংগঠনকে তেমন গুরুত্বও ঠাকুর দেননি। তাঁর বাণী নিয়ে সৎসঙ্গ সম্পর্কে কোনও আলাদা আবেগ প্রকাশ পায়নি। তিনি গুরুভক্তির কথাই বলতেন। আর তাঁর আন্দোলনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সংগঠনকে নয়। আর বিবেকানন্দ সম্পর্কে বললে বলতে হয়, উনি স্বয়ং তাঁর গুরুকে অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণদেবকে যত লোক জানে তার চেয়ে বিবেকানন্দকে জানে অনেক বেশি। অন্তত দু-তিনজন স্বামীজি আমাকে বলেছেন, স্বামীজিই তাঁদের সব। আমরা যারা ঠাকুরকে নিয়ে চলি তাদের এ ব্যাপারটায় একটু অস্বস্তি হয়। স্বামীজি বিশাল মানুষ, ঐশী শক্তি ও ধী-র অধিকারী, অসন প্রজ্ঞাও বিরল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তো স্বয়ং পূর্ণাবতার! তবু অনেকের কাছেই স্বামীজির গুরুত্ব বেশি।

মানুষের মাপজোক করার উদ্দেশ্য আমাদের নয়। ঠাকুরের জবানীতে বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ পাই। অনেকে মনে করেন যে, ঠাকুর স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব। অবশ্য সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি ব্যাকুলও নই। ঠাকুরের যে মূল্যায়ন আমার জীবনে ঘটেছে তাতে তিনিই আমার ভগবান এবং তিনিই ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—তা আমার বোধশক্তির বাইরে হলেও। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হোন বা না হোন।

ঠাকুরের মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে অনেকে নানা রেফারেন্স টেনে আনেন। আমার তো মনে হয়, তার তত দরকার নেই। ঠাকুরকে নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলেই এবং নাম-ধ্যান নিরতিই তাঁর ঐশী রূপকে উৎঘাটিত করে দেয়।

" মনোযোগী হতে যেও না—
আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলো—
মনোযোগ আপনিই আসবে।"

(শিক্ষা বিধায়না, বাণী ৭১)

মনোযোগী হওয়ার জন্য আড়ে-হাতে লাগলে বিস্মৃতিই এগিয়ে আসে। একথা ঠাকুর ওই গ্রন্থেই বলেছেন। বাণীটি পড়ে যেন আমার চোখ খুলে গেল। কী আশ্চর্য! আমিও তো এরই শিকার। মনোযোগী তখনই হওয়া যায় যখন ভিতরে অন্তরাস বা আগ্রহ জেগে ওঠে। তাই ঠাকুর যাত্রা বা নাটকের উদাহরণ দিয়েছেন। ওসব দেখতে মনোযোগ লাগেনা। আগ্রহই প্রধান হয়ে ওঠে। উপন্যাস পাঠও তেমন। আগ্রহ থাকে বলেই মানুষ ওসব বিস্মৃত হয় না সহজে। মানুষের মনের কী আশ্চর্য সমীক্ষা ঠাকুরের! নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তো জানি, যত মনোযোগ দিয়েছি তত বিষয় অনধিগত থেকেছে। আর যাতে আগ্রহ বা ভালবাসা কিংবা অনুরাগ আছে সেটা আপনিই হয়ে গেছে।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও একথা অতি সত্য যে, ভালবাসা এসে গেলে আর কসরৎ করতে হয়না। তখন ঠাকুর যা বলেছেন তা অনুসরণ করতে ক্লেশ বা ক্লান্তিও আসেনা। ধ্যান আপনিই হয়। নামও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। আর ওইটেই এক আনন্দের সময়।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা আমার কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু ওই ভাবভূমিতে সর্বদা অবস্থান করার মতো নিষ্ঠা ছিলনা বলে আমার পতনও ঘটেছে। তার মূলে আছে আমাদের আলস্যতাড়িত জীবনযাপন। কখনও তেড়েফুঁড়ে নামধ্যান করলাম, আবার কখনও এলিয়ে পড়লাম। পুরষোত্তম যেমন সদা জাগ্রত, সদা-চেতন, সদা-সাড়াশীল, তেমন তো আমরা নই। কিন্তু ঠাকুর চাইতেন আমরা এরকমই হয়ে উঠি। আমাদের নিয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ ছিলনা। আরও থেকে আরওতর হয়ে উঠবার প্ররোচনা তিনি সবসময়েই দিতেন।

ঠাকুরের কাছে সমাজের সব শ্রেণির মানুষই আসতেন। সব রকমের মানুষও। প্রত্যেকেরই চাহিদা-প্রবণ মানসিকতা। আমরা নানা সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশাতেই ঠাকুরকে ধরেছি বা আশ্রয় করেছি। ঠাকুরও সকলকেই আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন। উদ্ধারের পথ নির্দেশ করেছেন। সকলের পথ এক নয়। কিন্তু নাম বা মন্ত্র এক। ওই এক মন্ত্রই কিন্তু নানা জনের মধ্যে নানাভাবে ক্রিয়াশীল। যার যেমন বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে নামের প্রতিক্রিয়া তার মতো করেই হবে। এ যেন এক বিচিত্র ও বিশাল গবেষণাগার। মানুষের আদি ব্যাধি, সুখ-সন্তোষ, সংকট-সমস্যা, সম্পর্কের টানাপোড়েন—এ সবের তো অন্তহীন প্রশ্ন। ঠাকুরকে সারাজীবন ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে এইসব খুঁতো মানুষকে নিয়েই। শেষদিকে ঠাকুরের শরীর যখন বেশ অশক্ত তখন তাঁর অবারিত দ্বারকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। যখন তখন যে কেউ যে কোনও মতলবে যাতে তাঁর কাছে যেতে না পারে তারই চেষ্টা। কিন্তু আর্তপীড়িত মানুষ বাধা মানতে চায়না, আর ঠাকুরও মানুষের জন্য ব্যাকুল। সে এক করুণ অবস্থা।

মানুষের সঙ্গ ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেননা। দিন রাত সবসময়েই তাঁর ঘরে কয়েকজন মোতায়েন থাকতেন। শুধু দেখভাল বা সেবা করার জন্যই কিন্তু নয়, মানুষের নৈকট্য ও সাহচর্যও ঠাকুরের প্রিয় ছিল। এরকমই আমার ধারণা। আর ঠাকুর যে ঘরেই থাকুননা কেন তা বড্ড খোলামেলা। দেওঘরের মূল আশ্রমে যে গোটা চার-পাঁচ পার্লার আছে তার সবক'টাই ঠাকুরের নির্দেশে এমনভাবে তৈরি যে, আবডাল নেই বললেই হয়। নিরালা নিবেশ বা বড় পার্লার দুটিতে গায়ে গায়ে বিশাল বিশাল খোলা জানালা। পর্দাটর্দার বালাই নেই। ফলে আমরা আশ্রমের চৌহদ্দিতে ঢুকলেই বহু দূর থেকে ঠাকুরকে দেখতে পেতাম। বন্ধ ঘরে, আড়ালে বা একা থাকতে ঠাকুর পছন্দ করতেননা। ফলে তিনি ঘরে আছেন না বাইরে আছেন সেটাই নির্ধারণ করা যেতনা। আর আমি তাঁর ওই মজার ঘর দেখে ভারি খুশি হতাম। মনে হত বহিরাগত, রবাহূত মানুষদের কাছ থেকেও তিনি দূরে থাকতে চাননা।

দীক্ষার পর থেকেই ঠাকুরই আমার জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালেন। তবে ব্যাপারটা ঘটেছে ধীরে, মন্থর গতিতে। ঠাকুর চটজলদি কারও জীবনে অনুপ্রবেশ করেন না। ভক্ত যতটা জায়গা দেয় তার ওপর নির্ভর করে তাঁর ভক্তহৃদয়ে অনুপ্রবেশ। আমি যদি আমার জীবনের লাগাম তাঁর হাতে তুলে না দিই তাহলে তিনি কিন্তু তা কেড়েও নেবেননা। অপেক্ষা করবেন। পরমপুরুষের বৈশিষ্ট্যই নিজে থেকে এগোননা। ভক্ত তাঁকে চায় কিনা এবং কতটা চায় তা বুঝে তবেই তিনি এগিয়ে আসেন। প্রথম প্রথম তো ঠাকুরকে নিয়ে আমার সংশয়ের অভাব ছিলনা। নানা সন্দেহ ছিল, অবিশ্বাস ছিল, লোকসজ্জা ছিল। কিন্তু ঠাকুরের অমোঘ অপার্থিব আকর্ষণে ধীরে ধীরে সেগুলি যত কেটেছে ততটাই আমার হৃদয়ে, সত্তায় তাঁর জন্য জায়গা হয়েছে।

মানুষের মনের এঁটোশালে একটু জায়গা চেয়েছিলেন ঠাকুর। সেই আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সমাধি অবস্থার ভাববাণীতে। যা বিধৃত রয়েছে পুণ্যপুঁথিতে। এই আকূলতা তাঁর সম্বল। ওই আকূলতার উৎস হল তাঁর অপার্থিব, অপরিমেয় ভালবাসা। এই ভালবাসা থেকে তাঁর ত্রাণ নেই। আর এই ভালবাসার জন্যই কত

কষ্ট পেতে হয় তাঁকে। তাঁর নিকটের মানুষজন, তাঁর পারিপার্শ্বিক, তাঁর দ্বারা উপকৃত মানুষ সারা জীবন কম উত্যক্ত করেনি তাঁকে। অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, বিরুদ্ধতা, নিন্দা, অপপ্রচার এসব তাঁর অঙ্গভূষণ।

ঠাকুরকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর বা সাতাত্তর। আজকাল এই বয়সে অনেক মানুষই সচল ও কর্মক্ষম থাকেন। কিন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক স্ট্রোক হওয়ায় ঠাকুরের শরীরের পূর্ণ সক্ষমতা ছিলনা। অন্যের কাঁধে ভর না দিয়ে হাঁটতে পারতেননা। কথাবার্তাও একটু জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী সজীব ছিল তাঁর অভিব্যক্তি। চারদিকটা আলো হয়ে থাকত। ওই আলো, ওই অপার্থিব রূপ যে শুধুমাত্র দেহজ নয় তা এই নাস্তিকের চোখও টের পেয়েছিল। এক পলকেই বোঝা যেত উনি সাধারণ নন, দৈনন্দিন নন, গড্ডালিকা প্রবাহের একজন নন। ইনি এক দুর্লভ ব্যতিক্রম, মানুষের আধারে অবতীর্ণ দেবত্বকে আমি সেই প্রথম অবলোকন করি।

চুপচাপ বসে থাকতেন ঠাকুর, তাঁর মস্ত চৌকির সাদা নিরাভরণ বিছানায়। কাঠের প্যানেল করা মস্ত আটচালা ঘর। কিন্তু গৃহসজ্জা বলতে তেমন কিছু নেই। সবচেয়ে যেটা আগে নজরে পড়ত তা হল নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা। কোনও সম্পন্নতার বা দারিদ্র্যের প্রকাশ নেই, বাহুল্য নেই, টানাটানিও নেই। কিন্তু সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। ঠাকুরের পরনের ধুতিটা ধপধপে সাদা, পৈতে ঝকঝক করছে, চটিজোড়া চকচকে, কোথাও কোনও মালিন্যের চিহ্নও নেই। আর গোটা আশ্রম চত্বরটাও তাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তকতকে ঝকঝকে। ওই পরিবেশটাই মন ভাল করে দেয়। প্রতিদিন এত যে বহিরাগতরা এসে ভিড় করত, তাও কিন্তু পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বিঘ্নিত হতনা। লাগাতার ঝাড়পোঁছ করা হত। এ তো গেল বাইরের পরিচ্ছন্নতার কথা। কিন্তু ঠাকুরের আসল কাজ তো মানুষের অন্তরের মালিন্য ঘোচানো। আর তার জন্যই তো তাঁর অজস্র নিদান, মুষ্টিযোগ এবং তুক।

হিমাইতপুর বা দেওঘরে যে পরিবেশে ঠাকুরকে জীবনের অধিকাংশ সময় কালাতিপাত করতে হয়েছে তা মোটেই তার অনুকূল ছিলনা। বিরুদ্ধতা, শত্রুতা, অসহযোগিতা তাঁর চিরকালের সঙ্গী। বিশ্বাসঘাতকতা বা কৃতঘ্নতার ঘটনাও বড় কম ঘটেনি। প্রেমময় ঠাকুরের যেন প্রাপ্তিই ছিল এইসব। এত ভালবাসলেন মানুষকে, পোকামাকড় জীবজন্তু গাছপালাকে, স্থাবরজঙ্গমকে, কিন্তু তাঁর প্রাপ্তির ঝোলা শূন্যই থেকে গেছে। সাধারণ গৃহস্থও পরিবেশ থেকে যে ভালবাসা বা প্রতিদান পায়ে ঠাকুরের তাও জুটেছে কিনা সন্দেহ। এ কথাটা ঠারেঠোরে তিনিই প্রকাশ করে গেছেন।

আমার মনে হয় ঠাকুরের ঐশী বিভা, তাঁর অতুল আত্মিক ঐশ্বর্য, তাঁর গভীর প্রেম তাঁকে একটু স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। লোকে দেখল, এঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে। ফলে তিনি হয়ে গেলেন দাতা, আমরা গ্রহীতা। দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক হওয়ার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই মানবিক ভালবাসা আর হল না। তাঁকে ভয় পাওয়া হল, ভক্তি করা হল, তাঁর খানিকটা প্রচারও হয়তো করলাম, আজ্ঞাবাহীও হলাম, কিন্তু দূরত্বটা ঘোচাতে পারলামনা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও এরূপ হয়েছিল। এত ভক্ত কিন্তু ভালবাসার লোক নেই। শুধু গোপিনীরাই ছিল যা ব্যতিক্রম।

অথচ প্রেরিত পুরুষ কতই না ভালবাসার কাঙাল।

ঠাকুর ভালবাসা চান আর আমরা সেটুকুই তাকে আর দিয়ে উঠতে পারিনা। আমার তাঁকে নিয়ে অভিজ্ঞতা খুব বেশি তো নয়। কিন্তু যতটুকু তাঁকে দেখেছি তা খুব মন দিয়ে, প্রাণভরে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে এমন শিশুর মতো সহজ সরল, নিষ্পাপ স্বর্গীয় হাসি আর অমন ভুবনভোলানো রূপবান মানুষটিকে ভালবাসাই তো সোজা এবং স্বাভাবিক। দেবতা টেবতা না ভেবে কাছের মানুষ করে নিলেই হয়।

দেবতা ভাবার একটা অসুবিধেও আছে। ঠাকুর ভগবান, সুতরাং তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দেহবোধ, ক্লেশ, চাহিদা থাকতে পারেনা। তিনি তো বিগ্রহ, রক্তমাংসের মানুষ হলেও তো সাধারণ নন। এইসব ধ্যানধারণাই ঠাকুরের সঙ্গে শিষ্যের দূরত্ব রচনা করেছে। বরং ঠাকুরকে মানুষ এবং আপনজন ভেবে ভেবে তাঁর স্বস্তি ও শান্তির

জন্য তৎপর হওয়া অনেক বেশি ভক্তির লক্ষণ। আর ঠাকুর বারবার এই কথাটাই আমাদের বলতে চেয়েছেন। চিমটি কাটলে তোমার যেমন লাগে, আমারও তেমনি লাগে।

আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে অদৃষ্টবাদিতার অবস্থান খুবই প্রবল। ঠাকুর এই প্রবণতা পছন্দ করতেননা। তিনি চাইতেন আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হয়ে উঠি। যেমন সত্যানুসরণে তেমনি অন্যত্র তিনি বারবার এই বার্তাটি দিয়েছেন। পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তাছাড়া আর একটা অদৃষ্ট ফদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হয়ে বসে থেকোনা। পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবেনা। সৎকর্মীর কখনও অকল্যাণ হয়না। একদিন আগে আর পরে। অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রকে ঠাকুর উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করেননি। তাঁর নির্দেশে শিষ্যদের বেশ কয়েকজন জ্যোতিষশাস্ত্র লিখেছেন এবং প্রথাগত প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে।

মজার ব্যাপার হল, ঠাকুর মাঝে মাঝে তিথি-নক্ষত্র, যোগ, অযাত্রা এসব নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এমনকী নতুন গেঞ্জি সেদিন পরবেন কিনা তাও ঠাকুরমশাইকে জিগ্যেস করতে পাঠাতেন। আবার দেখা যেত অশ্লেষা মঘা কিছুই তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেননা। এটা কিন্তু তাঁর বৈপরীত্য নয়। আসলে বার্তাটি হল তাঁকে স্মরণে মননে রাখলে এবং নিষ্ঠা থাকলে কোনও বাধাই বাধা নয়।

ঠাকুরকে দেখলে সকলেরই মনে হবে একজন শিশুর মতো সরল ও খোলা হৃদয়ের মানুষ। হাসিটি অপাপবিদ্ধ আর তাতে প্রসন্নতার উপচে পড়া লাবণ্য। এত অহংহীন যে, মুগ্ধ হয়ে যেতে হত। আবার তেমনি ছিলেন কূটকৌশলী। মানুষকে এত গভীরভাবে বুঝতেন যে তাদের সঠিক নিশানায় চালিত করতে পারতেন। আসলে ঠাকুরকে পরিমাপ করার মতো মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই। নানাভাবে তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে দেখেছি, ঠিকমতো তাঁকে পরিস্ফুট করা যাচ্ছে না। আসলে ঠাকুর তো সাধারণ মানুষের মতো সীমায়িত পুরুষ নন। সাধারণ একজন মানুষের মতোই তাঁর অবস্থিতি, অথচ নিজেকে অতিক্রম করে রয়েছেন। তাই তাঁর কোনও মাপজোক করাই অসম্ভব ব্যাপার।

ঠাকুরকে দেখতাম মাঝে মঝেই শিষ্যদের কারও কাছ থেকে টাকা চাইতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পকেট থেকে দিলে হতনা, ভিক্ষে করে আনতে হত। আর এটাই ছিল কঠিন কাজ। সেই আমলে সৎসঙ্গে কার পকেটেই বাড়তি পয়সা থাকত? ফলে ভিক্ষে করতে নাভিশ্বাস উঠে যেত। অবশ্য শেষ অবধি জোগাড়ও হয়ে যেত কিন্তু। এই ভিক্ষে করে টাকা জোগাড় করার পেছনে কি ছিল তা নিয়ে আমরা সকলেই বিস্তর ভেবেছি। অহং-এর দাওয়াই হতে পারে, জন সংযোগের প্রশিক্ষণ হতে পারে। গ্রহদোষ বা কর্মফল কাটানো হতে পারে এবং হতে পারে এইভাবে জড়তা কাটিয়ে ম্যানিপুলেশন এবং ম্যান ম্যানেজমেন্ট শেখা।

ঠাকুর চাইতেন অভিজ্ঞতা অর্জিত হোক হাতেকলমে কিছু করে। বই পড়ে বা অন্যের মুখে শুনে যে জ্ঞানার্জন হয় সেটাই একমাত্র জ্ঞান নয়। আর এই জন্য তিনি ঋত্বিকদের বাড়িতে চাষবাস, গো-পালন, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষদের যাতে অন্নচিন্তা না থাকে তার জন্যই তিনি চাইতেন চাষবাস বা হাতের কাজ শিখে তা দিয়ে অন্তত অন্নবস্ত্রের সংস্থানটা তারা করে ফেলুক। ঋত্বিকরা তারই সহায়ক হয়ে উঠবেন ঠাকুরের এমনটাই ইচ্ছা।

সমষ্টির আন্দোলনের চেয়ে ব্যষ্টির বিকাশ যে অধিক জরুরি ঠাকুর তা অকাট্যভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। অল্পশিক্ষিত, অনিয়ন্ত্রিত, অবনিয়িত ব্যষ্টিকে নিয়ে যে সমষ্টি তৈরি হয় তার অভিমুখ হয় বিশৃংখলার দিকে। ওতে কোনও মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়না। ব্যষ্টি বা ব্যক্তিই হল আসল কথা। প্রতি এক যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে তাহলে প্রত্যেকে মিলে সত্যিকারে ভাগবত জনগোষ্ঠী তৈরি হতে পারে। ঠাকুর সারা জীবন পতিত, অপদার্থ, অকর্মণ্য, অকিঞ্চন, অকৃতীদের নিয়েই চলেছেন। গড়েপিটে তাদেরই করে তুলেছেন জীবনমুখী মানুষ। এই আন্দোলন প্রক্রিয়ায় কোনও ঢক্কানিনাদ নেই। কিন্তু ক্রমাগতি আছে।

ঠাকুরের প্রতি গভীর বিশ্বাস দেখেছি সবচেয়ে বেশি অতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে, যারা লেখাপড়া তেমন জানেনা, বুদ্ধিজীবী বা চিন্তাবিদ নয় এমন সব মানুষ। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চ পর্যায়ের নয় বা যারা খুব একটা ভাবনাচিন্তাও করেনা। মাথায় বেশি বিদ্যে বা মারপ্যাঁচ থাকলে সহজ সরল বুঝ ও বিশ্বাস আসতে চায়না।

দীক্ষা নেওয়ার পর আমি যেটুকু ভক্তি ও বিশ্বাসের পাঠ বা শিক্ষা নিয়েছি তা ওইসব সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। খুব সাদামাটা খেটে-খাওয়া মানুষ এমন গভীরভাবে ঠাকুরকে ভালবাসে যে, তার চোখমুখ অভিব্যক্তি থেকেই ঠাকুরের বিচ্ছুরণ পাওয়া যায়। তারা তাত্ত্বিকভাবে ঠাকুরকে তেমন বুঝতে পারেনা, ঠাকুরের বাণীগ্রন্থ হয়তো তাদের কাছে অধিগত করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাকুরের ভগবত্তাকে তারা খুবই গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। সংশয় সন্দেহ তাদের কণ্টকিত করে কমই।

আর ঠাকুরেরও বহু রূপ, বহু অভিব্যক্তি, বহু ভূমিকা, কখনও তিনি যুগাতিশায়ী প্রজ্ঞাবান পুরুষ, কখনও হামা-দেওয়া শিশুর মতো সরল, কখনও মানুষের জটিল মানসিকতার সন্ধানী অভিযাত্রী, কখনও পুরনারীদের সঙ্গে রঙ্গপ্রিয় রসিক, সমাজের নানাস্তরের মানুষ তাঁর কাছে এসেছে এবং সকলের সঙ্গেই ঠাকুরের কী সুন্দর সহজ সম্পর্ক। পরস্পরকে বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি। মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত থেকে অক্ষরজ্ঞানহীন চাষা কারও সঙ্গেই মিশতে তাঁর কোনও জড়তা দেখা যায়নি। ঠাকুরের প্রথম যুগের লীলাসঙ্গীরা কেউই শিক্ষিত ছিলেন না। কোকন, বুনে এঁরা ভক্তির জোরেই অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলেন।

আমার তো মনে হয় ঠাকুরের প্রচার প্রসার যতটুকু হয়েছে তা ওইসব সাধারণ মানুষের জন্যই। ঠাকুর যাদের ঋাত্বিকের পাঞ্জা দিয়ে কাজে নামিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন নিতান্তই সাধারণেরও সাধারণ। তাঁদের মধ্যে অতি অকিঞ্চন চাষীবাসিরাও আছেন, খেটে-খাওয়া কায়িক শ্রমজীবী মানুষও আছেন। তাঁদের সম্বল ছিল ভক্তি আর বিশ্বাস। যে অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা যাজন করেছেন তা এখন কল্পনাও করা যায়না। বিনিময়ে যা পেয়েছেন তা বস্তুগত লাভ নয়, বরং তাঁর অমেয় আশীর্ব্বাদ। তাঁদের গুণগান কেউ করেনি, জয়ধ্বনিও দেয়নি, জাগতিক প্রতিষ্ঠাও তাঁরা লাভ করেননি। কিন্তু তাঁরা নিজেদের ধন্য বলে ঠিকই বোধ করেছেন।

সাধক বা যোগীপুরুষরা একরকম প্রেরিতপুরুষেরা অন্যরকম। সাধকদের মধ্যে তিনটে ভাব বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যায়। শিশুভাব, উন্মাদভাব এবং পিশাচভাব। প্রেরিতপুরুষদের সেরকম হয়না। কিন্তু তাঁরা এত কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এবং স্বাভাবিক হন যে সেটাই অস্বাভাবিক মনে হয়। ঠাকুরও তাই। বলতেন প্রেরিতপুরুষেরা Abnormally normal. ঠাকুর যে কতখানি নরমাল বা স্বাভাবিক তা বিচার করা আমাদের বোধবুদ্ধির সাধ্য নয়। কিন্তু তবু বলি অত স্বাভাবিক বলেই ঠাকুরকে বুঝতে ভক্তদের অসুবিধে হত।...

এই রচনার আসলে কোনও শেষ নেই। যতদিন আমি ভক্ত জগতে আছি ততদিন তাঁর কথা আমাকে লিখে যেতে হবে। তবে এই গ্রন্থটি এখানেই শেষ হল।

—